

বসন্ত

শারদীয় সংকলন ২০২২

সংখ্যাঃ ১২



Bangali Society for Puja & Culture Inc. (BSPCI) WA, Australia

TAX Returns Company Audits GST/BAS Preparation



*Special deal
new clients* **4**

*Call for a quote
08 9470 3560*

Morshed Hasan CPA

ATLAS BUSINESS SOLUTIONS Auditors & Accountants Australia

461 Albany Hwy, Victoria Park, WA- 6100,
PO BOX 26, PARKWOOD, WA 6147
Tel: 08 9470 3560 (W), Mob: 0474 154 695
E-mail: h.morshedul@atlasbusiness.com.au
www.atlasbusiness.com.au

- We are offering you first consultation free, 10% discount for new clients, best quality services*
- We are providing you personalised services.
- Once you become our client you will get free consultation for future*.
- We are providing advices to grow your business as well as your wealth.

*Conditions apply

Our Services:

Tax Returns for

- > Company, Trust, Partnership, Personal
- > Self managed superfund
- > Rental Property tax

GST/BAS Preparation

- > Bookkeeping/Payroll
- > Formation of Trust/Company/SMSF
- > Tax advice/Tax strategy to minimise tax liabilities
- > Business consultation/advice
- > Superannuation strategy to save tax

Auditing & Assurance

- > External & internal audits
- > Public company and other company audits
- > Not for profit organisation audits
- > Charities and incorporated association audits
- > Real estate & settlement agent trust account audit
- > Motor vehicle dealers trust account audits
- > Strata title and outgoing audits
- > Franchise audits
- > Schools and Universities accounts/funds audit
- > Self managed superfund audit

- Find a suitable business structure that suite you
- Investment property consultation
- Business Tax Planning
- Financial Accounting and reporting
- Fringe Benefit Tax (FBT) calculation
- Our experienced team members are highly dedicated for client and having more than 10 years work experience in accounting industry.

**We use advanced tools & techniques
to minimise tax liabilities**

**Special Offers
for New Clients**



**Ausbangla
Enterprise**

OPEN 7 DAYS

9:30am - 8:00pm

Thursday

9:30am - 8:30pm

AUSBANGLA ENTERPRISE (INDIAN GOURMET CANNINGTON)

**Cannington Butchers
Fresh Fruits & Vegetables**

Shop 4/ 1468 Albany Hwy

CANNINGTON - 9356 3746

ausbanglaenterprise@yahoo.com.au

ausbanglaenterprise.com.au



We are local & fast where SATISFACTION will always last.

FLOORING

No matter your budget or the size of your home, we can help you obtain beautiful flooring at a competitive price.

TILES

Tile is perfect for high-traffic areas in your home and rooms that are susceptible to dirt, moisture or humidity.

LANDSCAPING

Fast's Solutions landscaping service offer installation of a range of quality artificial grass, decking, paving.

HOME IMPROVEMENT

Quality renovation builders who work with discerning homeowners from concept to completion.

Russell: 0493105409

E-mail: fastsrestorations@gmail.com, enquiry@fastsfloorings.com.au

Visit us: fastssolutions.com.au

Paul Tax & Accounting Services

Individual Tax Return from \$50

- > Rental Property Tax Return*
- > Company, Partnership, Trust and SMSF Tax Return*
- > Company, Trust and SMSF set up*
- > Tax Planning > Small Business Setup*
- > GST Return > Bookkeeping Services*

Contact: 0433003415

Biplab Paul

Paul Tax and Accounting Services

Registered Tax Agent and Public Accountant

Masters of Accounting (Central Queensland University)

M.Com (DU) B.Com (Hons) DU

Email: paul_biplab7@yahoo.com.au





Wahid Khan
Senior Financial
Planner.

Mobile: 0433 221 832

Wahid.khan@blueriverfinancial.com.au

Corporate Authorised
Representative of Respect Financial
Services Pty Ltd [AFSL 508000] AR
328412/CRN 390251



Our Services :

1. Home Loan & Investment loan with Best Rate
2. Building Superannuation Assets.
3. A Retirement Plan tailored to your goals and objectives.



Tax (financial) adviser
25064890

Important Information
The information contained in this may be confidential. You should only read, disclose, re-transmit, copy, distribute or act in reliance on the information if you are authorised to do so. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and then destroy any electronic or paper copy of this. Respect Financial Services Pty Ltd does not represent, warrant or guarantee that the integrity of this communication has been maintained, nor that the communication is free of errors, virus or interference. Any attached documents may be subject to copyright. No part of it should be reproduced without the consent of the copyright owner.
GENERAL ADVICE & DISCLAIMER: Any recommendation or advice contained in this email is not intended to be financial advice and is for general information only. Readers should only act on information after having received professional advice appropriate to their personal circumstances.



Ferdinand Jap:
Senior Finance Manager

Mobile: 0413 262 523

Email: ferdinand@blueriverfinancial.com.au

Express yourself with...

Ananyna's COLLECTION



Sarees

Salwar Suits

Kurtis

Palazzos

Men's Panjabi

Jewelry

Leather Bags



View only by Appointment.

CONTACT - Anu 0413161491

LOCATION - 9/88 Broadway
Nedlands 6009



বন্ধন

::সম্পাদকীয় ::

BANDHAN

সংকলন ২০২২,

সংখ্যা- ১২

আশ্বিন ১৪২৯

Magazine 2022

Issue 12

October 2022

বন্ধন সম্পাদনা পরিষদ

সৌমিত্র শীল

পান্না বড়ুয়া

বিশ্বজিৎ বসু

প্রভাত রায়

Bandhan Editorial Committee

Saumitra Seal

Panna Barua

Biswojit Bose

Provat Roy

প্রচ্ছদ

ছবি: পিন্টারেস্ট

সৌমিত্র শীল

প্রভাত রায়

Cover Design

Graphics: Pinterest

Saumitra Seal

Provat Roy

Page Makeup

Biswojit Bose

অলঙ্করণ

বিশ্বজিৎ বসু

English Proof reading

Prithul Bisshay

প্রকাশক:

বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার, অস্ট্রেলিয়া।

Publisher:

The Bangali Society for Puja and Culture (BSPC) Inc.

WA, Australia.

বিঃদ্রঃ লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নয়।

পৃথিবীর তাবৎ বাঙালীর অন্যতম পার্বণ শারদ উৎসব বছর ঘুরে আবার এলো। বন্ধু, স্বজন নিয়ে মেতে থাকার একটা দিনের জন্যে বাঙালির উন্মুখ হয়ে থাকে, সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে ছাপিয়ে পড়তে চায় মন। এই শারদোৎসব বাঙালির একেইয়ে নিবিড় কর্মমুখর প্রবাসী জীবনে যেমন নিয়ে আসে স্বস্তির আশ্বাস, সৌহার্দ্যের ডালি, একীভূত হওয়ার আকাজ্জা, তেমনি নিয়ে আসে গুহাচিহ্ন হওয়ার অনুপ্রেরণা। আশা করবো সংবৎসরের জরা মালিন্য ছাড়িয়ে ত্রিনয়নী সবার ঘরে প্রশান্তির হওয়া নিয়ে আসেন।

‘বন্ধন’,- Bangali Society of Puja & Culture Inc (BSPCI) WA, Australia-র এই শারদীয় মুখবন্ধন আবার প্রকাশিত হলো। এবারকার প্রকাশনা ধারাবাহিকতার সাংখ্যিক অর্থে এক যুগোত্তীর্ণ হলো। প্রতিবারের মতো এবারেও উদ্দীপনার কমতি নেই। প্রবাস জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও সৃষ্টিশীলতার নেই কোনো ঘাটতি। আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রে চিত্রশিল্পী থেকে শুরু করে পরিপক্ক মৌসুমী লেখক-লেখিকারা নিপুন সৃষ্টির ছোয়া রেখেছেন বন্ধনের পাতায় পাতায়। সম্পাদনা পর্ষদ ছাড়াও পর্দার পেছনে থেকে যাঁরা এ প্রকাশনার রসদ জুগিয়েছেন- লেখা এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে, বিবিধ প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে, তাঁদের প্রতি রইলো সহৃদয় সহমর্মিতা। বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ভুবনমোহিনী দশভুজা সবার ঘরে অহিংসার প্রদীপ দীপমান করুন, মানবীয় অসুর বধ করার শক্তি যোগান সবার মনে- এই কামনা রইলো এবারকার সম্পাদনা পর্ষদ হতে।

Saumitra S. Seal

Bangali Society for Puja and Culture Inc. (BSPCI), WA Executive Committee 2022-2023

President	: Prabir Sarker
Vice-President	: Goutam Sharma
General Secretary	: Sharmistha Saha
Assist General Secretary	: Alokesh Pramanik
Treasurer	: Bappi Roy
Cultural Secretary	: Aspari Chanda
Assist. Cultural Secretary	: Prama Mazumdar
Religious Secretary	: Lovely Debnath
Assistant Religious Secretary	: Mitul Das
Publication Secretary	: Saumitra Seal
Assist. Publication Secretary	: Panna Barua Liza
General Member	: Partha Sarathi Deb
Advisory Members	: Jahar Chowdhury
	: Shrabani Seal (Rimi)
	: Anu Sharma
Ex Officio	: Dipok Chandra Sarker
	: Uttam Kumar Dewanicee





বার মাসে তেরো পার্বণ: বাঙালির উৎসব প্রিয়তা

- শর্মিষ্ঠা সাহা

বাঙালির অনেক দুর্নাম – অলস, ঘরকুনো, আবেগী আরও কত কি। কিন্তু সবার উপরে বাঙালি উৎসব প্রিয় – বার মাসে তার তেরো পার্বণ। উৎসব ঘরকুনো বাঙালিকে ঘরের বাইরে এনে অলসতার খোলশ ভেঙে দেয়। উৎসবের ডামাডোলে সব নেতিবাচক অপবাদ ঘুচে গিয়ে ধরা পরে অতিথীপরায়ণ বাঙালির স্বরূপ। উৎসব মানেই আত্মীয়, বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী এক হয়ে আনন্দ উদযাপন। নানা স্বাদের খাবারের সুস্বাদু রসনা বিলাস। নাচ, গান, নাটক, কবিতার মুর্ছনায় অভিভূত করা দিন।

যুগ যুগ ধরেই উৎসবের সঙ্গে খাদ্যের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদযাপন থেকে শুরু করে চৈত্র সংক্রান্তিতে বর্ষ বিদায় – সর্বত্রই বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাবারের উপস্থিতি। খাবারের বৈচিত্র্যও নজর কাড়া – নাড়ু, লুচি, পায়েস, পিঠা, মোরগ পোলাও, বুরহানি, মোগলাই, কাচ্চি বিরিয়ানি, গুটকি, মাছের কালিয়া, ছানার ডালনা, পাচন, মুড়িঘন্ট, ভর্তা, ভাজি, শাক, ডাল, চাটনি, আচার – লিখতে থাকলে পাতা ভরে যাবে, খাবারের নাম শেষ হবে না। বহু উৎসবের আবার বিশেষ বিশেষ খাবার। নাড়ু- লুচি না হলে যেমন দুর্গা পূজা জমে না, মাংস – পোলাও – সেমাই না খেলে তেমন ঈদ হয় না। হরেক রকম পিঠা পায়েস না হলে কি পৌষ পার্বণ হয়!

বাঙালির উৎসবের সঙ্গে খাদ্য ছাড়াও আরও একটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত – সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ, গান, কবিতা, নাটিকা না হলে উৎসব পূর্ণতা পায় না। বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে আবার শিল্প – সাহিত্য চর্চাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। একুশের বইমেলা, স্বাধীনতা দিবসে বানান প্রতিযোগিতা, বিজয় দিবসে দেয়াল পত্রিকা, সরস্বতী পূজায় স্মরণিকা, লক্ষ্মী পূজায় আলপনা – সৃষ্টিশীল মনন চর্চার অব্যাহত ক্ষেত্র। স্থান কাল পাত্র ভেদে উপস্থাপনায় ভিন্নতা থাকলেও মননে সবই বাঙালি সংস্কৃতি।

বার মাসে তেরো পার্বণের প্রসঙ্গ এলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এই উৎসবগুলো কি কি। অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা ধরনের উৎসবের তথ্য মেলে। এদের একটির সঙ্গে অন্যটির একশতাংশ মিল খুঁজে পাওয়া ভার। আবার প্রকৃতিগতভাবেও এসব উৎসবের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। বাংলায় মূলত ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এ তিন ধরনের উৎসবের প্রচলন রয়েছে। বাংলার আদি পার্বণগুলো মূলত হিন্দু ধর্মীয় ও উপজাতিদের উৎসব। এসব উৎসবের অনেকগুলোই সময়ের বিবর্তনে পুরোদস্তুর সামাজিক রূপ নিয়ে বাঙালির উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে তেরো পার্বণের একটি তালিকা করার চেষ্টা করেছি। তবে কাজটি করতে গিয়ে মনে হয়েছে বাঙালির উৎসবের সংখ্যা আসলে তেরোর চেয়ে অনেক বেশি। অঞ্চলভেদে এসব উৎসবের মধ্যে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। কাজেই আমার করা এই তালিকা নিয়ে মতদ্বৈততা থাকতেই পারে।

বৈশাখ মাসে নববর্ষ ও হালখাতা, জ্যৈষ্ঠমাসে জামাই ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গা পূজা, কার্তিকে কালি পূজা ও ভাদ্রদ্বিতীয়া, অহ্মানে

নবান্ন, পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা ও হাতেখড়ি, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা আর চৈত্রমাসে চড়ক পূজা। এই হলো মোটমুটি আদি তের পার্বণ। তবে এগুলো ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি উৎসব বাংলায় প্রচলিত আছে – গাঙ্গি, লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, ভাদ্র উৎসব ইত্যাদি। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম আগমনের মধ্য দিয়ে ঈদ উল ফিতর, ঈদ উল আযহা, মহরম শবে বরাত, ঈদে মিলাদুন্নবির মত উৎসবগুলো বাঙালি সমাজে জায়গা করে নিয়েছে। এর বাইরেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু দিবসগুলো শিক্ষিত সমাজে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়ে থাকে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের বাঙালিদেরকে আরও বেশ কয়েকটি জাতীয় উৎসব উদযাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস, ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ষোলই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এখন বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলোর উদযাপনের আড়ম্বর অন্য যেকোন উৎসবের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি।

বাংলা নববর্ষ

বাংলা নববর্ষ এখন বাঙালির অন্যতম জাতীয় উৎসব – সরকারি ছুটির দিন। অতীতে বর্ষবরণের আনুষ্ঠানিকতা মূলত গ্রামাঞ্চলে পালিত হলেও বহু বছর ধরে এ উৎসব নগরকেন্দ্রিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে। পহেলা বৈশাখের সকাল শুরু হয় রমনার বটমূলে গানে গানে বর্ষ বরণের মধ্য দিয়ে। সারাদিন জুড়ে চলে মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলাসহ নানা আয়োজন। রাজধানীর জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের অনুকরণে সারা দেশে সকল জেলা শহরে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হয়। সরকারি বেসরকারি টিভি চ্যানেল বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

গ্রামবাংলার কৃষক পরিবারে চৈত্রসংক্রান্তির রাতে গৃহিণীরা আমানি তৈরি করে। একটি বড় হাঁড়িতে অনেকটা জলের মধ্যে আম আর কিছু চাল ভেজানো হয়। আর ওই হাঁড়ির ভেতর রাখা হয় একটি সপত্র আমের ডাল। ভোরবেলা বাড়ির সবাই ওই ভেজানো চাল খায়, আর আমের ডাল দিয়ে সবার গায়ে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে শরীর ঠান্ডা থাকে বলে তাদের বিশ্বাস। এদিন সবাই সাধ্যমত ভাল ভাল খাবারের আয়োজন করে। বছরের প্রথম দিন ভাল খাবার খেলে সারা বছরই ভাল খাবার পাওয়া যাবে – এমন বিশ্বাস সকলের। পয়লা বৈশাখে গ্রাম-বাংলায় গমের ছাতু, দই, পাকা বেল দিয়ে তৈরি বিশেষ শরবত খাওয়ার প্রচলন বহুকাল থেকে।

বাংলা নববর্ষ কেন্দ্রিক একটি পরিচিত উৎসব হালখাতা। জমিদারির খাজনার হিসাব-নিকাশ হতো চৈত্র সংক্রান্তির দিনে। সারাবছর কে কত খাজনা জমা করেছে, কার কত খাজনা বাকি রয়েছে তা চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যে চূড়ান্ত হতো। এরপর বৈশাখের প্রথম দিনে, বাংলা নববর্ষের দিনে নতুন খাতায় সেই হিসাব তোলা হত। এই প্রথা হালখাতা নামে পরিচিত। অনেক অঞ্চলে এ প্রথা পুণ্যহা নামেও পরিচিত। পরবর্তীকালে এই হালখাতার চল দোকানে-দোকানে





ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দোকান মালিকরাও তাদের ক্রেতাদের হিসাব-নিকেশ নতুন খাতায় তুলে রাখতে শুরু করেন নববর্ষের দিনে। যার ফলে হালখাতা উৎসব এক ব্যাপক আকার নেয়। হালখাতার এই উৎসব আজ অনেকটা স্নান হলেও আনন্দের ঘনঘটা এখনও রয়েছে। ব্যবসায়ীরা এদিন তাদের ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করান।

নববর্ষে উদযাপিত আদিবাসীদের একটি উৎসব সাগ্রাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা পুরাতন বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে জাঁকজমকের সঙ্গে এটি পালন করে থাকে। এ উৎসব চলে চারদিনব্যাপী – পুরোন বছরের শেষ তিনদিন আর নতুন বছরের প্রথম দিন। বছরের প্রথম দিন মারমা ও রাখাইন সম্প্রদায় পানি খেলায় মেতে ওঠে। চৈত্রের শেষ দুদিন এবং পয়লা বৈশাখ এই তিনদিন ব্যাপী চাকমাদের ভেতর মহাসমারোহে পালিত হয় বিজু উৎসব। প্রথম দিন ফুল বিজু, দ্বিতীয় দিন, মূল বিজু এবং পয়লা বৈশাখ গোজ্যাই পোজ্যার দিন। একই বর্ষবরণ উৎসব ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের কাছে বৈসাবি নামে পরিচিত।

জামাই ষষ্ঠী

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী পূজা করা হয়। ষষ্ঠীকে সন্তান দেবী মনে করা হয়। ঘর বা মন্দিরের বাইরে বট, করমচার ডাল পুঁতে প্রতীকী অরণ্য রচনা করে এই পূজা করা হয়। তাই এই তিথিকে অরণ্য ষষ্ঠীও বলা হয়ে থাকে। জামাইয়ের দীর্ঘায়ুর সঙ্গে মেয়ের মঙ্গল কামনার বিষয়টি জড়িয়ে আছে। শাশুড়ি নিজের জামাইয়ে সুখ ও দীর্ঘায়ু কামনা করার মধ্য দিয়ে নিজের মেয়ের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। জামাইকে আদর-আপায়ন করার মধ্যে দিয়ে এই লোকায়ত প্রথা পালন করা হয়ে থাকে।

রথযাত্রা

রথযাত্রা কেন করা হয় এ নিয়ে বেশ কিছু প্রচলিত মতভেদ রয়েছে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের স্মরণে এই উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে। আবার কথিত আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের দেবলীলা পূর্ণিমাতে স্নানের পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন জগন্নাথদেব। পনের দিন পরে সুস্থ হয়ে বলভদ্র এবং সুভদ্রার সঙ্গে তার মাসি বাড়ি যাত্রার উৎসবই রথযাত্রা। আষাঢ় মাসের শুরুপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় রথযাত্রা উৎসব। এই পূণ্য তিথিতে কাঠের তৈরি রথে করে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের বিগ্রহকে পরিভ্রমণ করানো হয়।

মনসা পূজা

মনসা পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য সাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। এজন্য অন্যান্য পূজার মত সাধারণ পূজা বিধি অনুসরণ করতে হয়। গোত্র ও অঞ্চল ভেদে প্রথার ওপর ভিত্তি করে মনসা দেবী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে তার ভক্তদের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে সর্প পূজা একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান। মনসা সাপের দেবী। তিনি মূলত লৌকিক দেবী। পরবর্তীকালে পৌরাণিক দেবী রূপে স্বীকৃত হন। শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রতিটি ঘরে ঘরে মনসা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী বা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী একটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসব। এটি বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। ভাদ্র মাসের

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মাষ্টমী পালিত হয়। কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গান বা কীর্তন, গীতিনাট্য, নাট্য, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। রাস লীলায় কৃষ্ণের ছোট বয়সের কর্মকাণ্ড দেখানো হয়, দহি হাভি প্রথায় কৃষ্ণের দুগ্ধ স্বভাব প্রতিফলিত করা হয় যেখানে কয়েকজন শিশু মিলে উচ্চস্থানে বেঁধে রাখা মাখনের হাড়ি ভাঙতে চেষ্টা করে। এই পরম্পরাকে তামিলনাড়ুতে উরিয়াদি নামে পালন করা হয়। কংসবধ, রাধা-কৃষ্ণ পালা প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষ্ণের জীবনী তুলে ধরা হয়ে থাকে।

বেরাভাসান উৎসব

বেরাভাসান উৎসবটি নদ-নদী ও হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে জলের সব রকম অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পালিত হয়। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার খোয়াজ-খিজিরের (জলের দেবতা বরুণের স্থলাভিষিক্ত) উদ্দেশ্যে উৎসবটি নিবেদিত হয়। মূলত ফকির সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। মুগল আমলে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল ও ঢাকায় নবাবদের উদ্যোগে মহা সমারোহে এ উৎসব পালিত হতো। এই লৌকিক উৎসবটি তখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। লোক-জীবনে এর প্রভাব এত গভীর যে, এটা এখনও নদীবহুল অঞ্চলে টিকে আছে। এ উৎসবে এক নিঃশ্বাসে কলাগাছ কেটে ভেলা বানানো হয় এবং তাতে নানা রকমের শিনী সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

ভাদু উৎসব

ভাদু পশ্চিমবঙ্গের একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব। বহুকাল আগে থেকেই এটি চলে আসছে এবং এখনও বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপিত হয়। পুরো ভাদ্রমাস ব্যাপী পুরুলিয়া জেলার হিন্দু মেয়েরা ভাদুর পূজা করে। জনশ্রুতি আছে যে, কাশীপুর রাজের অবিবাহিতা কন্যার ভাদ্র মাসে মৃত্যু হওয়ায় তাকে স্মরণ করার জন্য এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। একজন বর্ষীয়ান মহিলা ভাদেশ্বর্যৈ নমঃ, বলে ভাদুমূর্তির দিকে ফুল ছুঁড়ে দেয়। এ সময় ভাদুর গান গাওয়া হয়। শেষ দিনে তারা সাশ্রলয়নে ভাদুকে বিসর্জন দেয়।

দুর্গা পূজা

দুর্গা পূজা বা দুর্গোৎসব হল দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত একটি সার্বজনীন উৎসব। দুর্গাপূজা সমগ্র ভারতে প্রচলিত। আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষে দুর্গা পূজা করা হয় যা শারদীয় পূজা নামে পরিচিত। দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রবাসীদের মাধ্যমে পালিত হয়ে থাকে। তবে হিন্দু বাঙালীর প্রধান উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড এবং বাংলাদেশে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুরু পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন মাসের শুরু পক্ষটিকে বলা হয় "দেবীপক্ষ"। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে দুর্গাসপ্তমী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত চার দিন সরকারি ছুটি থাকে। বাংলাদেশে বিজয়াদশমীতে সর্বসাধারণের জন্য এক দিন সরকারি ছুটি থাকে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এই পূজায় সাগ্রহে অংশগ্রহণ করে থাকে।

কালী পূজা, দীপাবলি

কালীপূজা একটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। কালীপূজা ও





দীপাবলী অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক মাসে অমাবস্যার সন্ধ্যায়। কার্তিক মাসটি মৃতের মাস বলে পরিগণিত। এই মাসে মৃত পিতৃপুরুষদের গতিপথ আলোকিত করতে আকাশপ্রদীপ জ্বালানো হয়। আবার ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে অযোধ্যায় আসলে প্রজারা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য রাতব্যাপী অযোধ্যায় আলোকসজ্জা করে। মন্দ শক্তির পতনের এই উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে আজও বিশ্বব্যাপী হিন্দুরা আলোর উৎসব করে থাকে। এভাবেই দীপাবলি ও কালীপূজা বাংলায় একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের অন্য প্রান্তে কালীপূজা ছাড়াই আলোর উৎসব হয়। দীপাবলি নামটির অর্থ প্রদীপের সমষ্টি ও আলোর উৎসব। এটি দেওয়ালী, দীপান্বিতা এবং যক্ষরাত্রি নামেও অভিহিত হয়। এই দিন হিন্দুরা ঘরে ঘরে ছোটো মাটির প্রদীপ জ্বালেন যা অমঙ্গল বিতাড়নের প্রতীক।

ভাই ফোঁটা

ভাইফোঁটা হিন্দুদের একটি লোকজ উৎসব। এই উৎসবের পোষাকি নাম ভাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠান। কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে (কালীপূজার দুই দিন পরে) এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ভারতে এই উৎসব ভাইদুজ নামেও পরিচিত। আবার, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্ণাটকে ভাইফোঁটাকে বলে ভাইবিজ। নেপালে ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে এই উৎসব পরিচিত ভাইটিকা নামে। এই উৎসবের আরও একটি নাম হল যমদ্বিতীয়া। ভাইফোঁটার দিন বোনেরা তাদের ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিষে দিয়ে ছড়া কেটে বলে-

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।।
যমুনার হাতে ফোঁটা খেয়ে যম হল অমর।
আমার হাতে ফোঁটা খেয়ে আমার ভাই হোক অমর।।

নবান্ন উৎসব

নবান্ন একটি বিশেষ লোকউৎসব। নতুন ফসল ওঠার পর অগ্রহায়ণ মাসে এ উৎসবটি এক সময় হিন্দুদের মধ্যে ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো। উৎসবের দিন ভোর না হতেই ছেলেমেয়েরা ঘরের বাইরে এসে ছড়া কেটে দাঁড়কাকদের নেমন্তন্ন করতো। এদিন নতুন চাল টেকেতে কোটা হয়। বেলা দশটার দিকে বাড়ির প্রবীণগণ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং ছেলেমেয়েরা নতুন জামা-কাপড় পরে। এরপর বাড়ির উঠানে গর্ত করে জ্যাস্ত কৈ মাছ ও কিছু দুধ দিয়ে একটি বাঁশ পোতা হয়। একে বলে বীর বাঁশ। বীর বাঁশের চারপাশে চালের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। বীর বাঁশের প্রতিটি কক্ষিতে নতুন ধানের ছড়া বাঁধা হয়। বীর বাঁশ পোতার পরে একটি কলার খোলে চালমাখা কলা ও নারকেল নাড়ু কাককে খেতে দেয়া হয়। কলাটি মুখে নিয়ে কাক কোন দিকে যায় তা লক্ষ করা হয়; কারণ তাদের বিশ্বাস, বছরের শুভাশুভ অনেকটা এর ওপর নির্ভর করে। কাককে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই পর্বটির নাম কাকবলি। শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে পূজা এবং নবান্ন দিয়ে পরে সকলে খাবার গ্রহণ করে। এদিন প্রত্যেক পরিবারেই উন্নত মানের খাবার তৈরি হয়। দিনের বেলা অন্যের বাড়িতে নবান্ন গ্রহণ করলেও রাতে নিজ বাড়িতেই খেতে হয়। নবান্নের শেষ হয় পরের দিন বাসি নবান্ন দিয়ে। একসময় মুসলিম পরিবারেও নবান্নের প্রচলন ছিল। সংস্কারবশত তারাও লক্ষ্মীর শির্নী দিত। একে তারা বলত

নয়াখাওয়া। উৎসবের আমেজ এদের মধ্যে থাকলেও হিন্দুদের মতো এত আনুষ্ঠানিকতা ছিল না।

গাঙ্গি উৎসব

গাঙ্গি আশ্বিনের শেষ রাত থেকে শুরু হয়। ফসল যাতে ভাল হয় সে উদ্দেশ্যে পরের দিন পয়লা কার্তিক সূর্যোদয়ের আগে কাঁচা হলুদ এবং নিমপাতা একসাথে বেটে সরিষার তেলসহ ধানগাছে মাখিয়ে দেওয়া হয়। অফলা গাছে ফল ফলানোর উদ্দেশ্যে গাছের ডালে শামুকের মালা বুলিয়ে দেওয়া বা গাছটি কেটে ফেলার অভিনয়ও করা হয়। এসময় মশা-মাছি ও পোকা-মাকড়ের প্রাদুর্ভাব রোধ করার জন্য পূর্বরাতে প্যাকাটি জ্বালিয়ে ছেলেরা ছড়া কাটে। নীরোগ স্বাস্থ্যের জন্য লোকেরা এ রাতে তেলাকুচার পাতা, হলদি, পান, নিম ইত্যাদি বেটে গায়ে মেখে স্নান করে। আশ্বিনের শেষদিন রান্না করে পরের দিন খায়। তাই জনশ্রুতি আছে, আশ্বিনে রান্নে-বাড়ে কার্তিকে খায়, যে যেই বর মাগে সেই বর পায়। সময়ের পরিবর্তনে বর্তমানে অবশ্য এ উৎসবের তেমন প্রচলন নেই।

পৌষ পার্বণ

পৌষপার্বণ বা পোষলা একটি শস্যউৎসব। এ উপলক্ষে মুসলিম রাখাল ছেলেরা মানিক পীরের গান গেয়ে, আর হিন্দু রাখালেরা লক্ষ্মীর নামে ছড়া কেটে সারা পৌষ মাস সন্ধ্যার পর বাড়ি বাড়ি মাগন করত। মাগনশেষে তারা পৌষ সংক্রান্তির সকালে মাঠ বা বনের ধারে রান্না করত; পিঠা বা শির্নী বানিয়ে পীর বা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করত এবং পরে নিজেরা খেত। একে পিঠাপর্বও বলা হতো। বর্তমানে পৌষপার্বণ উৎসবটি গ্রামবাংলার পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ব্যাপকভাবে পালিত হয়।

সরস্বতী পূজা ও হাতেখড়ি

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পালিত হয় সরস্বতী পূজা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সানন্দে পূজার প্রস্তুতি অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা। সরস্বতী হলেন বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী। শাস্ত্র মতে সরস্বতী পূজার দিন বিদ্যারম্ভের জন্য শ্রেষ্ঠ। বাঙালি সমাজে হাতেখড়ির মাধ্যমে শিশুর বিদ্যাশিক্ষা শুরু করা হয়। এদিন পূজার পর মা, বাবা অথবা পুরোহিত শিশুর হাত ধরে স্নেহে 'অ, আ, ক, খ' লিখিয়ে অক্ষর পরিচয় করান। এই হাতেখড়ি প্রথার মধ্য দিয়ে শিক্ষার জগতে প্রবেশ করে সেই শিশু।

দোলযাত্রা

দোলযাত্রা এমনি একটি সনাতন বৈষ্ণব উৎসব যা ধর্মের গন্ডি পেরিয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাংলার বাইরে পালিত হোলি উৎসবটির সঙ্গে দোলযাত্রা সম্পর্কযুক্ত। এটির উদ্ভব ভারতীয় উপমহাদেশে হলেও দক্ষিণ এশীয় প্রবাসীদের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল এবং পশ্চিমা বিশ্বের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। এই উৎসবের অপর নাম বসন্ত উৎসব। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোল যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দোল উৎসবের অনুষ্ঠানে ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে দোলপূর্ণিমা বলা হয়। দোলযাত্রায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ দিকও রয়েছে। এই দিন সকাল থেকেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে আবির, গুলাল ও বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। শান্তিনিকেতনে বিশেষ নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালনের রীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকেই চলে আসছে।





চৈত্র সংক্রান্তিতে বর্ষ বিদায়

চৈত্র সংক্রান্তির দিন পালিত হয় চড়ক পূজো। এটি হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকোৎসব। চৈত্রের শেষ এবং বৈশাখের প্রথম দুদিন ব্যাপী এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একে শিবঠাকুরের গাজন উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়। এ দিন বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে এবং তা চলে কয়েক দিন ধরে। লাল কাপড় পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে, গলায় রত্নাক্ষের মালা এবং হাতে ত্রিশূল নিয়ে শিবের সাজ, সঙ্গে আবার দেবী পার্বতীর সাজে কেউ একজন, এদের সঙ্গে আবার খোল-করতাল, ঢাক-ঢোল নিয়ে কিছু জন। দলটির মধ্যে একজন আবার পাগল সাজে থাকে। যাকে হনু বলে পরিচয় দেওয়া হয়। এরা দলে দলে বাড়ি বাড়ি ঘোরে এবং শিব-পার্বতীর গান গেয়ে অনুষ্ঠান করে। এই সঙ সাজের দলকে নীল বলে। এদের আবার একজন দলপতি থাকে যিনি নীল ঠাকুরকে হাতে ধরে থাকেন। বাড়ির উঠোন লেপে বা কোনও গৃহস্থ উঠোনে আলপনা দিয়ে দেয়। সেখানেই নীলকে প্রতিষ্ঠা করে চলে নীলের নাচ বা শিবের গাজন। এটা নীল উৎসব নামে পরিচিত।

এই দিনের আরও একটি বড় অনুষ্ঠান হল গম্ভীরা নাচ। আজও বরেন্দ্র অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রাজশাহীতে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চল বলতে মালদহ ও দুই দিনাজপুরে চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা নাচ হয়। গম্ভীরা নাচের সঙ্গে হয় গম্ভীরা পূজো এবং শিবের গাজন। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রাম-বাংলার আরও এক বিশেষ উৎসব তালতলার শিরনি। এই দিনে প্রতিটি বাড়ি থেকে চাল, তালের গুড়, দুধ সংগ্রহ করা হয়। এরপর গ্রামের কোনও পবিত্র তাল গাছের নিচে বা বটগাছের নিচে এই জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি হয় শিরনি। যা তালতলার শিরনি নামে পরিচিত। এরপর তা গ্রামের মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়। চাকমাদের ঘরে এইদিন পাজন রান্নার আয়োজন হয়। পাজন হল নানা সবজির মিশালি এক তরকারি। এই দিন বাড়িতে যে সব বন্ধু বা অতিথিরা আসে তাদের এই পাজন দিয়ে আপ্যায়ণ করেন চাকমারা। তাদের ধারণা বছর শেষের দিনে সব ধরনের সবজি দিয়ে তরকারি খেলে মঙ্গল। এতে নতুন বছরে শুভ সূচনা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন ত্রিপুরায় বসবাসকারী মানুষজনও বাজার অথবা পাহাড় থেকে ফুল সংগ্রহ করে। চৈত্রের শেষ দুদিন এবং নববর্ষের প্রথম দিন নিয়ে ত্রিপুরায় পালিত হয় বৈসু। এই দিন ত্রিপুরায় ব্যাপকভাবে পিঠার আয়োজনও হয়।

বাংলাদেশে আস্ত সম্প্রদায় সম্প্রীতির কথা উঠলেই একটা বহু ব্যবহৃত শ্লোগান উঠে আসে - ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। উৎসবপ্রিয় বাঙালির হৃদয়ে একাত্মতার ভাব জাগাতে এর চেয়ে ভাল উপায় আর দ্বিতীয়টি নেই। উৎসবের আমেজ পেলেই বাঙালি ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা ভুলে একত্রে মিলিত হয়। আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে বাঙালির জুড়ি নেই। সাথে যদি থাকে মুখরোচক খাবার আর গান বাজনা, তাহলে তো সোনায়ে সোহাগা। কাজেই সময়ের বিবর্তনে তেরো পার্বণ বেড়ে কখন যে চব্বিশ পার্বণ হয়ে গেল - উৎসবপ্রিয় বাঙালি সেটা জানতেই পেল না। বেশি বেশি ভাল লাগা, বাঁধ ভাঙা আনন্দ, হা হা হি হি - মন্দ কি!!

তথ্য সূত্র: প্রচলিত রীতি ও ইন্টারনেট।

--O--

ক্যানাইন টিথ

- নাসরীন মুস্তাফা

অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে চাওয়ার ফোনটার ওপারে ঘ্যাঘঘেষে কণ্ঠস্বর জোর দিয়ে জানিয়েছিল, বেশি রাতেই আসতে চান। সেই মতো রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশে এলেন তিনি।

মাথার উপর চেপে বসানো হুডিতে মুখ স্পষ্ট না হলেও পুরু কাল কাঁচের চশমার আড়ালে ঢাকা চোখ বিভ্রান্তি ছড়ায়। অন্ধ নন তো? খুক করে কেশে বলি, আমি কিন্তু দাঁতের ডাক্তার।

-তা-ই তো চাই। দাঁত বের করে হাসতেই মুখের দুই পাশে ঝুলে পড়ে ঝকঝকে দুই খান ছুরি। হায়েনার মতো হাসি হেসে তিনি বলেন, কেটেকুটে ছোট করে দেবেন। ঠিক ততটাই, যতটা মানুষের থাকে।

এত বড় ক্যানাইন টিথ বাপের জন্মে দেখিনি বলে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে বেশ। মাংসাশী প্রাণীদের এই দুটো দাঁত বড় থাকে, কেননা মাংস ছিঁড়ে খেতে সুবিধে হয় বেশ। শাকাহারী হতে গিয়ে কালে কালে ছোট হয় দাঁত, ঠিক ততটাই, যতটা মানুষেরই থাকে।

গলা শুকিয়ে কাঠ মনে হতেই প্যাকেট জ্যুসের মুখের ছিদ্রে ঢোকানো স্ট্র দুই ঠোঁটে চেপে ধরে দেই জোরে টান। বুকটা ঠান্ডা হয়ে যায় নিমিষেই। সুস্বাদু পানীয় জোর দেয় মনে। বলি, এরকম দাঁত আগে দেখিনি।

- দাঁত কাটতে চেয়েছি কি আগে যে দেখবেন?

- এখন কেন চাইছেন

ঘ্যাঘঘেষে কণ্ঠস্বর ঠান্ডা হিম ছড়িয়ে জানায়, এখন আর শিকারের গলা কামড়ে ধরে দাঁত ফোটানো লাগে না। প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে, তাই না?

আমার হাতে ধরা প্যাকেটের দিকে ইঙ্গিত তার। বলে, প্যাকেটেই মিলে যায় মানুষের তাজা রক্ত। কী দারুন স্বাদ, বলুন!

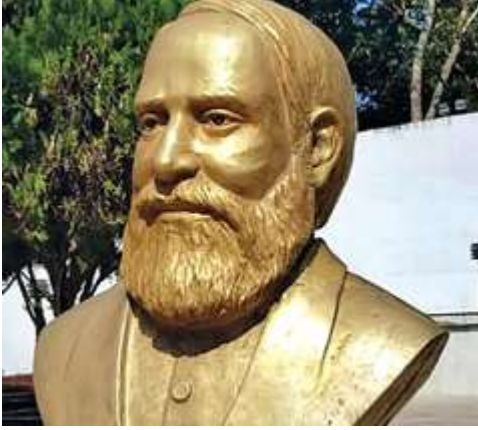
হাতে ধরা প্যাকেটের মুখের ছিদ্রে ঢোকানো স্ট্র দুই ঠোঁটে চেপে আয়েশে টান নিতেই তৃপ্তিতে চোখ যেন বুঁজে আসে তার। সেভাবেই বলেন, প্রযুক্তি কেটে দেবে দাঁত। কেউ আর টের পাবে না আমি কে। এরপর চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে দিব্যি চোখ টিপে দেন। বলেন, আমরা কে!

--O--

BSPCI Event Calender 2022-2023

1. Kali Puja- 24 October 2022
2. Saraswati Puja- 26 January 2023
3. BBQ Picnic Sports-Labour Day Holiday
4. New Year - 15 April 2023
5. AGM- First Saturday of July
6. Pitha Utsob - Last Saturday of August
7. Durga Puja- 21 to 22 October 2023
8. Kali Puja - 12 November 2023
9. Grand Cultural Night - 18 November 2023





মীর মশাররফ: নব জাগরণের আরেক নক্ষত্র

- বিশ্বজিৎ বসু

মীর মশাররফ হোসেন, বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আঠার শতকে যে কজনের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য তর তর করে উপরে উঠে গেছে তাঁদের একজন তিনি। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে উপজীব্য করে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে তাঁর হাত ধরেই এসেছে। সে হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনক!

মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম তৎকালীন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার লাহিনী পাড়া গ্রামে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "এডুকেশন গেজেট" প্রকাশিত তাঁর বাবার জীবনী অনুসারে মশাররফের জন্ম ১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর। তাঁর বাবার নাম মীর মোয়াজ্জেম হোসেন মায়ের নাম দৌলতুন্নেছা।

মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের পিতা মীর এবরাহিম কিশোর বয়সে পদমদি হতে সাঁওতা গ্রামে গিয়ে তার এক জ্ঞতি বোন সাঁওতার জমিদার আনার খাতুনের বাড়িতে আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং সেই নিঃসন্তান বোন মীর এবরাহিমকে তার জমিদারি লিখে দেন। মীর মোয়াজ্জেম ছিলেন সেই জমিদারের উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত জমিদারীর মীর মোয়াজ্জেমের অংশ তার চাচাত বোনের স্বামী জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নেন। এরপর তিনি লাহিনী পাড়ায় মুন্সী জেনাভুল্লাহর একমাত্র কন্যা বিবি দৌলতুন্নেছাকে বিয়ে করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এটা ছিল মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের দ্বিতীয় বিয়ে। সাঁওতায় থাকাকালীন সময়ে তিনি প্রথম বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী এক পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে অকালে মারা যান, কিছুদিন পর সে পুত্রও মৃত্যুবরণ করে। স্ত্রী পুত্র হারিয়ে মীর মোয়াজ্জেম কিছুটা সংসার বিমুখ হয়ে পড়েন এবং চাচাত বোনের স্বামীকে জমিদারি দেখাশোনার ভার দিয়ে ভাগীর বাড়িতে বেড়াতে যান কিছুদিনের জন্য। সেই সময়ে চাচাত বোনের স্বামী জাল দলিল করে মোয়াজ্জেম হোসেনের সম্পত্তি দখল নেয়। মীর মোয়াজ্জেম ভাগীর বাড়ী থেকে ফিরে আর নিজ বাড়ীতে উঠতে পারেন নাই। মোয়াজ্জেম হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি দৌলতুন্নেছার গর্ভে চার পুত্র এবং দুই কন্যার জন্ম হয়। মশাররফ ছিলেন তাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মশাররফের গণনা শিক্ষা শুরু হয় তাঁর মায়ের কাছে। পাঁচ বছর বয়সে মুন্সী জমিরউদ্দিনের হাতে আরবি হরফ লেখার মধ্য দিয়ে

অনুষ্ঠিত হয় তাঁর হাতে তাম্বী (হাতে খড়ি)। হাতে তাম্বীর পর মাসিক দুই টাকা বেতনে মুন্সি হেসারতুল্লার নিকট শুরু হয় তাঁর আরবী এবং ফারসি শিক্ষা। এক বছরের মধ্যে তিনি কোরাণের প্রথম পাঠ পড়া শেষ করেন। এ সময়ে তিনি গ্রামের জনৈক দুর্গা চরণ রায়ের কাছে তার হাতের লেখার অনুকরণে বাংলা অক্ষর লেখা শুরু করেন।

মীর কিছুদিন পর পাশে জয়নাবাদ গ্রামের জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় ভর্তি হয়ে সেখানে বাংলা শিক্ষা শুরু করেন। কিছুদিন পর মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের অনুরোধে জগমোহন নন্দী তাঁর পাঠশালা লাহিনীপাড়ায় মশাররফদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর তিনি পাশের সান পুকুরিয়া গ্রামের মুন্সি কসিমউদ্দিনের মজবে ফারসি শেখার জন্য ভর্তি হন। দশ বছর বয়সে তাঁর পিতা তাকে দিয়ে বাংলায় চিঠিপত্র লেখাতে শুরু করেন। এই চিঠি লেখার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর গদ্য লেখার অভ্যাস। পিতার প্রয়োজনে কখনও কখনও তাকে ছয়-সাত ঘণ্টা দোয়াত কলম নিয়ে বসে থাকতে হতো।

মশাররফ ছিলেন মাতৃভক্ত। উদাসীন পথিকের মনের কথা উপন্যাসে তিনি মায়ের রূপ এবং গুণের কথা বর্ণনা করেছে। তাঁর চোখে তাঁর মা ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিতা। জমিদার বাবার জীবন যাপন ছিল সে সময়কার অন্য জমিদারদের মতই। তিনি ছিলেন সংগীত ও নৃত্যের ভক্ত, নিজে ভাল সেতার বাজাতে পারতেন। বাড়িতে রাতে নাচ - গানের আসর বসতো। অত্যাচারী নীলকর টমাস আইভান কেনির সংগে ছিল তার সখ্যতা, নীল বিদ্রোহের সময় তিনি কেনীর পক্ষ নিয়েছিলেন। মশাররফের যখন চৌদ্দ বছর তখন তাঁর মাকে এক নর্তকীর ষড়যন্ত্রে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে বাড়ির এক দাসী। একই বছর তাঁর বোনের মৃত্যু হয়। এটা ছিল কিশোর বয়সে দুটি বড় আঘাত।

স্ত্রীর আপঘাতে মৃত্যু মীর মোয়াজ্জেমের আবার সংসার বিমুখ হয়ে পড়েন। তিনি পূর্বপুরুষের বাড়ি পদমদিতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এ অবস্থায় মশাররফ অনেকটা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় মশাররফের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া। বয়ঃসন্ধিক্ষণে মায়ের মৃত্যু এবং বাবার উদাসিন্য মশাররফ জীবনের এক অন্ধকার সময়। বয়ঃসন্ধির এসময়টা তাঁর কেটেছে মাতামহীর আদরে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বাদ থাকলেও তাকে সে সময় মাতামহীর অনুরোধে আসরে পুথি পাঠ করে শোনাতে হতো। প্রতিবেশী এবং বাড়ির দাস দাসীরা ছিল সে আসরের শ্রোতা। এসব আসরে পুথি পাঠের মধ্যে দিয়ে তার পড়া হয়ে যায় কেয়ামত নামা, হাজার মসলার পুথি, জৈগুনের পুথি, সোনাভান, সামর্থভান, আমীর হামজা, হাতেমতাই প্রভৃতি বিখ্যাত পুথিগুলো।

পুথি পাঠের পাশাপাশি এসময়ে তিনি তাঁর ফারসি গুরুর সাথে বিভিন্ন স্থানে বায়েতে বাহাস (কাব্যসুক্ষরী) অংশগ্রহণ করতেন। কবিতার লড়াইয়ে তিনি নানা ধরণের ধাঁধা রচনা করে দর্শকদের নজর করতেন। তাঁর রচিত এরকম একটি ধাঁধা-

কামার এর মার ফেলে
পাঠার ফেলে পা
লবঙ্গর বঙ্গ ফেলে
বেছে বেছে খা।

এটি ছিল তাঁর রচিত প্রথম ধাঁধা। এসময়ে তাঁর সাথে পরিচয় হয় কাঙাল হরিনাথ এবং লালন ফকিরের সাথে। এরপর থেকে তিনি





কাঙাল হরিনাথের গ্রামবার্তা প্রবেশিকাতে লেখা শুরু করেন। গ্রামবার্তা প্রবেশিকা প্রকাশিত হতো কুমারখালি হতে। গ্রামবার্তা প্রবেশিকাতে কোন লেখায় মীর মশাররফের নাম ছাপা হতে না। লেখক হিসাবে লেখা হতো "গৌড়িত বাসী মশা"।

তিনি চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করেন সংবাদ প্রভাকরে এবং সেখানে সংবাদ পাঠানো শুরু করেন। সংবাদ প্রভাকর প্রকাশিত হতো কোলকাতা থেকে। তখন সংবাদ প্রভাকর সম্পাদনা করতেন কবি ঈশ্বরগুপ্তের ছোট ভাই রমাপ্রাণ গুপ্ত। কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা হিসাবে সংবাদ প্রভাকরে তাঁর সংবাদ প্রকাশ হতো। বছর খানেক পর মোয়াজ্জেম হোসেন লাহিনী পাড়ায় গিয়ে মশাররফকে নিয়ে আসেন পদমদি। পাশেই তাঁর জ্ঞাতি চন্দন মৃগীরোগ জমিদার মীর আহম্মদ আলীর বাড়ি। পদমদি থেকেই মশাররফ তাঁর জীবনের প্রথম ভ্রমণে বের হন। প্রথমে মীর আহম্মদ আলীর দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আব্দাচ্ছামদের বিয়েতে বরযাত্রী যান বরিশালের বামনার জমিদার বাড়িতে। বরযাত্রী দলের নেতা ছিল মীর আহম্মদ আলীর বড় পুত্র মীর মহাম্মদ আলী। বরিশাল যাবার পথে মহাম্মদ আলীর বজরায় মশাররফ পরিচিত হন বাইজী সংস্কৃতির সাথে। এই মীর মহাম্মদ আলী পরবর্তীতে নবাব উপাধী পান।

বরিশাল থেকে মীর বাবার সাথে যান ঢাকায়। ঢাকায় তারা উঠেন তাদের এক আত্মীয় ওয়াহেদ আলীর বাসায়। সে বাসাতে পরিচয় হয় একজন হিন্দু শিক্ষকের। বাংলার প্রতি মশাররফের আগ্রহ দেখে সেই শিক্ষক মশাররফকে তারাশংকর তর্করত্ন অনূদিত সংস্কৃত নাটক কাদম্বরী এর বাংলা অনুবাদ উপহপার হিসাবে দেন। অর্থ বোঝার জন্য শব্দার্থ প্রবেশিকা নামে একটি বাংলা অভিধান কেনার সুপারিশ করেন। মীর বাবার কাছ থেকে তিন টাকা নিয়ে সে বইখানি কিনেন। সেই শিক্ষক তাকে অভিধান হতে শব্দ খুঁজে বের করা শিখিয়ে দেন। এই শব্দার্থ প্রবেশিকা গ্রন্থটিই মশাররফের বিস্ময় বাংলা লেখার সূত্র।

বরিশাল এবং ঢাকায় ছয়মাস ভ্রমণ শেষে ফিরে মশাররফ পিতার সংগে ফিরে আসেন লাহিনী পাড়ায়। এই ভ্রমণে বামনা এবং শায়েস্তাবাদের জমিদার পরিবারে ইংরেজি চর্চা দেখে মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের ইংরেজি ভাষার প্রতি আগ্রহ জন্মে এবং ফিরে এসে ১৮৬১ সালে মশাররফ ও তাঁর ছোট ভাই মহত্যাশামকে ভর্তি করেন কুষ্টিয়া ইংরেজি স্কুলে। এই ভাই পরবর্তীতে ব্যারিস্টারি পাশ করে কোলকাতায় প্রাকটিস করতেন। ইংরেজি স্কুলে মশাররফ ইংরেজি বর্ণমালার সাথে বিদ্যাসাগরের বোধদয় পড়া শুরু করেন। কিছুদিন পর কয়েকজন বন্ধু মিলে বাড়িতে না বলে কোলকাতা বেড়াতে যান। কোলকাতায় তারা এক বন্ধুর কাকার বাসায় কদিন থেকে লাহিনীপাড়ায় ফিরে আসেন। এমন সময়ে নবাব বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজি-বাংলা স্কুল। মীর মোয়াজ্জেম ছেলেকে নিয়ে আসেন পদমদিতে এবং মশাররফকে ভর্তি করেন পদমদির নব প্রতিষ্ঠিত স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে। সেটা ১৮৬৩ সালের কথা। কিন্তু মশাররফ পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে জ্ঞাতিভাই মহাম্মদ আলীর সংস্পর্শে নাচ, গান বাইজি প্রভৃতি আমোদে মত্ত হয়ে পড়েন। মশাররফকে নিয়ে নানা কান কথা শুরু হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই পদমদি ছাড়তে হয়। বাবা তাকে পাঠিয়ে দেন নদীয়া জেলার কেন্দ্রস্থল কৃষ্ণনগরে। মীর ভর্তি হন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে। নদীয়ার এক বছর জীবনযাপন মশাররফের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

এখানকার ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরেন। শেরওয়ানি আচকানের পরিবর্তে ধূতি পাঞ্জাবি পরা শুরু করেন।

নদীয়া থেকে তিনি আবার পালিয়ে কোলকাতায় চলে যান। সেখানে গিয়ে দেখা হয়ে যায় তার বাল্যবন্ধু বন্ধু কারাম মৌলার সাথে। কারাম মৌলা তাঁর পিতৃবন্ধু নাদের হোসেনের পুত্র। নাদের হোসেন তখন চব্বিশ পরগনা জেলার আমিন। মশাররফ নাদের হোসেনের বাড়িতে গিয়ে উঠেন। কিছুদিন কলকাতা বেড়ানোর পর ফিরে আসেন কৃষ্ণনগরে। নাদের হোসেন মশাররফকে তার বাড়ীতে থেকে কালীঘাট স্কুলে পড়ার প্রস্তাব দেন এবং মীর মোয়াজ্জেমকে চিঠি লিখে তার ইচ্ছার কথা জানান। তিনি জানান মশাররফ এবং তার পুত্র কারাম মৌলা একসঙ্গে কালীঘাট স্কুলে পড়বে। বাবার অনুমতি পেয়ে মশাররফ ১৮৬৫ সালে তিনি চলে যান কোলকাতায় বাবার বন্ধু নাদের সাহেবের বাড়িতে।

নাদের হোসেনের গ্রামের বাড়ি ছিল যশোরের মুক্তারপুরে, কপোতক্ষ নদের তীরে। সেখানে তার প্রথম স্ত্রী তিন কন্যা এবং এক পুত্র থাকতেন। নাদের সাহেব তার বড় মেয়ে লতিফনের সংগে মশাররফের বিয়ে দেয়ার লক্ষ্য বাড়ীর খানসামাকে দিয়ে প্রস্তাব দেন। খানসামা নানা ভাবে চেষ্টা করে মশাররফকে রাজী করান। বিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নাদের হোসেন তার প্রথম পক্ষের ছেলে ফজলে মিয়া এর সেই খানসামার সংগে মীরকে মুক্তারপুরে পাঠান। এখানেই মশাররফের একাডেমিক পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তারপুরে গিয়ে লতিফনের সাথে সাক্ষাৎ সা হলেও পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। লতিফন মীরকে যে প্রথম চিঠি দিয়েছিল তাতে লেখা ছিল –

কাকে বিষ্ঠা খায়, অনর্থক ডাকে, পেটে কিছুই রাখেনা, ছোট লোক মুর্থ যা ইচ্ছা তাই খায় পেটে রাখে না। মুর্থের দলে বদনাম, ব্যস্ততায় নানা বিঘ্ন। কিছুই গোপন থাকিবে না। শয়ন শয্যা স্বহস্তে পরিস্কারের আশা। যেখানে পাইবেন সেখানেই রাখিবেন। পাইব

- কেহ নয়
কালী কলম।

এই চিঠিখানা মীর আমৃত্যু নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছিলেন। এরপর তাদের মধ্যে নিয়মিত পত্র বিনিময় চলতে থাকে। লতিফন এক পত্রে লিখেন- "ধর্ম প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। আমি তোমার তুমি আমার। তুমি আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী। শেষ চিঠির এক অংশে লতিফন লিখে প্রিয় প্রাণ, প্রানের ভালবাসা স্বামী, গত রাতে স্বপ্ন দেখিতেছি তোমার আমার বিবাহ হইতেছে। ধর্ম স্বাক্ষী করিয়া বিবাহ হইতেছে। ইহারই মধ্যে দক্ষিণ দিক হইতে একটি পেট মোটা ব্রাহ্ম আসিয়া আমাকে ঘর ভাঙ্গিয়া লইয়া গেল। এ চিঠিতে লতিফন নিজেকে পরিচয় দেন -তোমার চিরঙ্গিনী স্ত্রী।

বিয়ের তখনও তিন মাস বাকি, অখন্ড অবসর। লতিফনের দেয়া কাগজ কলমে তিনি "মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি" নামে একটি প্রবন্ধ লিখে সংবাদ প্রভাকরে পাঠিয়ে দেন। এটি তার প্রথম প্রবন্ধ। এ সময়ে কাঙাল হরিনাথের গ্রামবার্তা প্রবেশিকা এবং সংবাদ প্রভাকরে নিয়মিত সংবাদ এবং রিপোর্ট পাঠানো শুরু করেন।

১৯শে মে ১৮৬৫ লতিফনের সাথে তার বিয়ের দিন ধার্য হয়। একই দিনে লতিফনের ছোট বোন আজিজনের বিয়ের দিন ধার্য হয়। তার





বিয়ে ঠিক হয় হোসেন আলী নামে বয়স্ক এক জমিদারের সাথে। সেই জমিদার প্রভাব খাটিয়ে ব্লাকমেইলিং করে লতিফনকে বিয়ে করেন। আর মীরের বিয়ে হয় আজিজনের সংগে। বিয়ের পর লতিফন অসুস্থ হয়ে পরে। জমিদার অসুস্থ লতিফনকে বাড়ীতে নিয়ে যান। অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে জমিদারের এক রক্ষীতা তাকে জোড় করে বিষ মেশানো আচার খাইয়ে দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায় লতিফন। মৃত্যুর পূর্বে আগে লতিফন মশাররফকে কাছে ডেকে নেয় এবং জানায় বিয়েতে সে কবুল করে নাই। মশাররফের কোলে মাথা রেখেই লতিফন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। হোসেন আলী গোপনে মুক্তারপুর ত্যাগ করে চলে যায়। প্রতারণার এ বিয়ে এবং লতিফনের মৃত্যু মশাররফকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত মশাররফ কিছুদিন পর লাহিনী পাড়ায় ফিরে পিতার জমিদারি দেখাশোনা শুরু করেন।

পিতার জমিদারি দেখাশোনার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত সংবাদ, রিপোর্ট, কবিতা, প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এ সময়ে সংবাদ প্রভাকরে তাঁর প্রথম কবিতা "গোলাপ" প্রকাশিত হয়। গোলাপ কবিতাটি এত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে প্রকাশক সংবাদ প্রভাকরের ঐ সংখ্যা পুনঃমুদ্রণ করেছিলেন।

সাহিত্যিক হিসাবে মীর মশাররফের উন্মেষ এসময়ে। কাঙাল হরিনাথ ছিলেন মশাররফের লেখার মূল প্রেরণাদায়ক, সংশোধক এবং সমালোচক। প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখার পাশাপাশি কাঙাল মশাররফকে গান লিখতে উৎসাহিত করতেন। এছাড়া সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতাও করেন। এজন্যে মীর মশাররফকে কাঙাল হরিনাথের সাহিত্য শিষ্য বলা হয়ে থাকে। রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে আমার আমার সব ফক্কির, কেবল তোমার নামটি রবে"

... ..
এই জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনি মশার ভরসা ভবে।

মশা ভণিতায় লেখা এই গানটি লিখে তিনি কাঙাল হরিনাথের "ফিকির চাঁদ" বাউল দলের সাথে যুক্ত হন। দলে তিনি মশা বাউল পরিচিত ছিলেন।

মশাররফের লেখার প্রেরণাদাতা হিসাবে আরেকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন সংবাদ প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ভূবন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সংবাদ প্রভাকরে মশাররফের লেখা সম্পাদনা করে ছাপাতেন, সমালোচনা করতেন এবং প্রেরণা দিতেন। ১৮৬৬ সালে তাঁর পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় মশাররফ হোসেনের প্রথম উপন্যাস রত্নবতী। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার চার বছর পর কোলকাতা হতে এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এটিই কোন মুসলিম লেখক কর্তৃক লিখিত প্রথম উপন্যাস। বইটির ভূমিকায় মীর মশাররফ হোসেন লিখেছিলেন

গাঁথিয়া কল্পনাসূত্রে নব-গল্পহার
সঁপিলাপ বন্ধুগণে নব-উপহার।

এ সময়ে মুসলিম রচনাকারদের বাংলা ভাষায় রচনার চর্চা ছিল না। এ প্রসঙ্গে মশাররফ হোসেন বলেন সাবেক ইসলামী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার সেবা মুসলমান সমাজে আমিই প্রথম করিলাম। উল্লেখ্য যে মীর মশাররফের পূর্বপুরুষ ছিলেন ইরাকের

বাগদাদ নগরীর বাসিন্দা। তাদের বংশপদবী ছিল সৈয়দ। তাঁর পূর্বপুরুষ শাহ সৈয়দ সাদুল্লা প্রথমে দিল্লি পরে ফরিদপুরের পদমন্দির পাশে স্যাকরা গ্রামে আসেন। তিনি তার গুরু পুত্র শাহ পাহলাওয়ান এর আশ্রয়ে সেখানে থেকে যান এবং তার কন্যাকে বিবাহ করেন। পরবর্তীতে তিনি রাজকার্যে পারদর্শিতার জন্য মীর উপাধি পান। যদিও রত্নবতী প্রকাশের নয় বছর পূর্বে শামছদ্দিন মোহম্মদ সিদ্দীকি নামে একজন "উচিত শ্রবণ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা প্রকাশ করেছিলেন। উচিত শ্রবণ রচনাটিই কোন মুসলিম রচনাকারদের প্রথম গদ্য রচনা হিসাবে স্বীকৃত।

১৮৭৩ সালে কোলকাতা হতে প্রকাশিত হয় মশাররফের প্রথম কাব্যগ্রন্থ গোড়াই ব্রিজ বা গৌরি সেতু। গৌরি সেতু কাব্যটি রামায়ণে বর্ণিত সাগর বন্ধনের কথা দিয়ে শুরু। কাব্যগ্রন্থটির প্রথম দুই লাইনে তিনি লিখেছেন-

"ত্রোতা যুগে সীতানাথ সীতা উদ্ধারিতে
বেঁধেছিল সিদ্ধনদ বানর সহিতে"

এবছরই কোলকাতা হতে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি নাটক বসন্ত কুমারী এবং জমিদার দর্পণ। বসন্ত কুমারী তাঁর প্রথম নাটক। এটি একটি কল্পনাশ্রী নাটক। লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ যে ভয়াবহতার সৃষ্টি করে সেটা তিনি তুলে ধরেছেন এ নাটকে। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেন "আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী প্রস্ফুটিত হইল"। নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মৌলভী আব্দুল লতিফ খাঁকে। উৎসর্গ পাতায় তিনি লিখেছিলেন "পরম শ্রদ্ধাপদ মৌলবী আব্দুল লতীফ খাঁ বাহাদুর শ্রদ্ধাপদেষু"।

জমিদার দর্পণ নাটকের পটভূমি ছিল ১৮৭২ সালে সিরাজগঞ্জে সংঘটিত কৃষক-বিদ্রোহ। তিনি নিজে জমিদার পুত্র হয়েও এ নাটকে তুলে ধরেছিলেন জমিদারের অন্ধকার দিক এবং গরীব কৃষকের অসহায়ত্ব। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে গ্রামবার্তা প্রবেশিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটি মীর উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জ্ঞাতিভাই পদমন্দির মীর মহাম্মদ আলীকে। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছিলেন "পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মহাম্মদ আলী সাহেব পূজ্যপাদেষু"। জমিদার দর্পণ নাটক প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখেছিলেন, 'জৈনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালা অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ"।

লাহিনীপাড়ায় পাশের গ্রাম শালঘর মধুয়ায় ছিল টমাস আইভান কেনির বাড়ী। বাল্যকাল হতেই মশাররফের যাতায়াত ছিল কেনীর বাড়িতে। কেনি এক সময় মশাররফকে তাঁর কন্যাদের সাথে ইংল্যান্ডে পড়তে পাঠাতে চেয়েছিলেন। নানীর আপত্তির কারণে সেটা হয়নি। নীল বিদ্রোহের সময় সুন্দরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরী দেবীর নেতৃত্বে কেনীর নীল ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। ফাল্গুন মাসের কোন একদিন মশাররফ একদিন ঘোড়ায় চড়ে কেনীর বাসায় যাচ্ছিলেন। যাবার পথে সাঁওতা গ্রামে সেদিন ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনের ভয়ে ভীত একটি কিশোরী মেয়ে দৌড়ে এসে মশাররফকে জড়িয়ে ধরে। মশাররফ মেয়েটিকে আগুনের হাত থেকে উদ্ধার করেন। মেয়েটিকে মীর আগে থেকেই চিনতেন। তার নাম ছিল কালী। সে ছিল এক অকাল বিধবার কন্যা। ১৮৭৪ সালে তিনি পাঁচ





হাজার টাকা দেনমোহরে কালীকে বিয়ে করেন। মশাররফের পারিবারিক পীর শাহ ওবায়দুল হক কালী নাম পরিবর্তন করে রাখেন বিবি কুলসুম। এ বিয়ের সময়ে মীর মশাররফ দুই পুত্রের জনক। প্রথম স্ত্রী আজীজানের গর্ভে দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা সন্তানটি অকালে মৃত্যুবরণ করে। এ বছরই তিনি প্রথম স্ত্রীর নামানুসারে "আজীজমাহার" নামে সাহিত্য পত্রিকা বের করেন। আজীজমাহার কোন মুসলিম সম্পাদক কর্তৃক বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা।

প্রতারণার বিয়ে এবং লতিফুল্লাহর মৃত্যু আজিজুল্লাহ- মীরের সংসারে প্রচণ্ড প্রভাবিত করেছিল। সংসারের প্রতি ছিল মীরের চরম ওদাসীন্য। জীবন যাপন ছিল অগোছালো, বেপরোয়া। বিবি কুলসুম তাকে ধীরে ধীরে সংসারমুখী করে তোলে। পরবর্তীতে বিবি কুলসুম হয়ে দাড়ায় তার সাহিত্যচর্চার মূল প্রেরণাদাতা। দ্বিতীয় বিয়ের অল্প কিছুদিন পর ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয় প্রহসন "এর উপায় কি?" সে সময়ে সমাজে বিত্তবানদের স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, স্বামীদের অন্য নারী এবং পতিতাদের প্রতি আকৃষ্টতা নিয়ে লেখা মীর মশাররফের তৃতীয় নাটক। নাটকটি বিত্তবানদের চক্ষুশূল হয়েছিল। ঢাকার একটি পত্রিকা "বান্ধব" এ এর বিরূপ সমালোচনা বের হয়েছিল।

আজিজুল্লাহ মীরের দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে পারে নাই। এ নিয়ে সংসারে শুরু হয় সপত্নী দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আজিজুল্লাহ ডাকাতের সাহায্য নিয়ে কুলসুম হত্যার প্রচেষ্টাও করেছিল। অসহনীয় পারিবারিক অশান্তির এসময় হারিয়ে যায় মীরের লেখক সত্ত্বা।

১৮৭৯ সালে মীর মশাররফ পদমদীর মীর আলী আহম্মেদের এস্টেটের তত্ত্বাবধায়ক পদে চাকরিতে যোগ দেন। এ চাকরিতে যোগদানের কিছুদিনের মধ্য মীর আলী আহম্মেদের মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র মীর মহাম্মদ আলী এস্টেটের উত্তরাধিকার হন। মীর মশাররফ মহাম্মদ আলীর অধীনেও কিছুদিন চাকরি করেন। ১৮৮৪ সালে দ্বিতীয় স্ত্রী কুলসুমকে সাথে নিয়ে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে বেগম করিমুল্লাহ চৌধুরানীর জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে চলে যান। বেগম করিমুল্লাহ ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার বড় বোন। করিমুল্লাহ মশাররফকে শান্তিকুঞ্জ নামে একটি পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করে দেন। মোশাররফ কুলসুমকে নিয়ে সেখানেই বসবাস করতেন।

দেলদুয়ারে সৃষ্টি হয় মশাররফ হোসেনের অমর কীর্তি বিষাদ সিন্ধু। ১৮৮৫ সালে টাঙ্গাইল প্রকাশিত হয় বিষাদ সিন্ধুর মরহরম পর্ব। কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসেনের করুণ মৃত্যুকে উপজীব্য করে লেখা উপন্যাস বিষাদ সিন্ধু। এ বিষয়ে লেখক মুখবন্ধে বলেন "পারস্য এবং আরব গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া বিষাদ সিন্ধু বিরচিত হইল"। বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বেগম করিমুল্লাহ চৌধুরানীকে।

বিষাদ সিন্ধু প্রকাশের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমাপ্রাণ গুপ্ত, রামতনু লীহিড়ী মশাররফের লেখনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। বিষাদ সিন্ধুই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে এই বিষাদসিন্ধু পাঠের আসর বসতো। ১৮৮৭ সালে ময়মনসিংহ হতে প্রকাশিত হয় বিষাদ সিন্ধুর উদ্ধার পর্ব।

এসময়ে তিনি টাঙ্গাইলে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেও দ্বায়িত্ব পালন করেছেন বলে যানা যায়।

গদ্য বা পদ্য লেখার পাশাপাশি তিনি মশাররফ একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গানের বই "সঙ্গীত লহরী"। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল লাহিনীপাড়া থেকে। সঙ্গীত লহরীর প্রতিটি গানের শুরুতে গানটির রাগ, রাগিণী ও তাল নির্দেশ করা আছে। ১৮৮৭ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পত্রিকা "হিতকরী"। কিন্তু সেখানে সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম ছিল না। সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হতো রাইচরণ দাস এবং প্রকাশক ছিলেন দেবনাথ বিশ্বাস। মুদ্রাকর ছিলেন রজনীকান্ত ঘোষ। হিতকরী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বলা হয় "হে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন করুণাময়, কৃপাময়, ভববন্ধু, ভগবান তোমরাই অনন্তগুণ আশ্রয় ও সহায় করিয়া হিতকরী ১২৯৭ সালের ১৫ই বৈশাখ প্রকাশ করা হলো। তুমিই রক্ষক, তুমিই প্রতিপালক, জীবন মরণ তোমারই হাতে। যা তোমার ইচ্ছা"। প্রথমে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে। তিন বছর পর এটি প্রকাশিত হয় টাঙ্গাইল থেকে। তখন সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয়েছিল মোসলেম উদ্দিন খাঁ, মুদ্রাকর সাধু সরকার এবং ছাপা হতো আহমদী প্রেস থেকে।

১৮৮৯ সালে টাঙ্গাইল হতে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ "গোজীবন"। এর আগে আহমদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গোজীবনের প্রথম প্রস্তাব "গোকুল নিমূল আশংকা"। বইটির উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেন "পঞ্চবিংশ কোটি ভারত সন্তান করে গো-জীবন সমর্পণ করিলাম"। ভারতবর্ষে গরু কোরবানি দেয়া নিয়ে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বিক অবস্থান সেটা নিরাময়ের স্বপ্নে তিনি এ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আহমদী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী। ইউসুফজয়ী ছিলেন টাঙ্গাইলের বিখ্যাত কবি। ১৮৮৬ সালে জুলাই মাসে পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দেলদুয়ারের জমিদারপত্নী করিমুল্লাহ খানম চৌধুরানী ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক।

গোজীবন প্রকাশের পর গোরক্ষানী সভার এলাহাবাদ অফিস হতে মীরকে সাধুবাদ জানিয়ে চিঠি দেয়। মীর সেটা বইয়ের মুখবন্ধে ছেপেছিলেন। অন্যদিকে নিজ সমাজে তিনি প্রচুর সমালোচিত হন। টাঙ্গাইলের সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাসভবনে সভা করে বলা হয় মীর সাহেব মুসলমান নন, তিনি কাফির এবং তার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে বলে ফতোয়া জারা করা হয়। ক্ষুব্ধ মীর মোশাররফ এ ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিলেন।

১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয় যাত্রাপালা "বেহুলা গীতাভিনয়"। বেহুলা গীতাভিনয় মূলত ভাসান যাত্রার আরেকটি পরিমার্জিত সংস্করণ। এপ্রসঙ্গে মশাররফ বলেছেন "শুভ্রিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত অঙ্গার ভস্মেই সূবর্ণকণা, সামান্য প্রস্তরেই কোহিনূর এবং দারইয়াই নূরের জন্ম। পরিসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণে এবং দৃষ্টান্ত স্থলে বলতে পারি মনসার ভাসানই বেহুলা গীতাভিনয়"। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ "উদাসীন পথিকের মনের কথা"। এগ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর জীবনের একটি অংশ, আঞ্চলিক রাজনীতি ও ইতিহাস, নীলকর কেনীর সাথে প্যারিসুন্দরী দেবীর দ্বন্দ্ব এবং চাচাত বোনের স্বামী কর্তৃক তাঁর বাবা মীর মোয়াজ্জেম হোসেনের জমিদারী হারানোর কথা।





১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় বিষাদ সিন্ধুর এজিদ্ পর্ব। এবছর তিনি রাজিয়া খাতুন নামে একটি উপন্যাস লিখেন। উপন্যাসটি তাঁর সম্পাদিত হিতকরী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ সালে মশাররফ দেলদুয়ার স্টেটের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দে জড়িয়ে পড়েন। সেসময়ের টাঙ্গাইলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, উকিল, ডাক্তার প্রমুখের চক্রান্তে টাঙ্গাইলের জমিদার পরিবারটি ধ্বংস হতে দেখে তিনি গোপনে রাতের অন্ধকারে একটি পোস্টার লাগান। পোস্টারে লেখা ছিল - "বসন্তের চির সহচর মদন। মদন হৃদয়ে আনন্দের সংযোগ হইলে, বিপিন বিহারী তাহাতে তাল যোগাইলে- সোনার লঙ্কা ছারখার হইতে কতদিন লাগে।" এই পোস্টারে কয়েকজন সরকারী কর্মচারি এবং দেলদুয়ারের এক মহিলা জমিদারকে বোঝানো হয়েছিল। কিন্তু কিছুই প্রকাশ পেয়ে যায় এটা মীর মশাররফ ছাপিয়েছেন। তখনকার মহাকুমা অফিসার শিব চন্দ্র নাগ তার এক কর্মচারিকে দিয়ে মশাররফের নামে মামলা করে। এজন্য তাকে হাজতে যেতে হয়। তার ভাই ব্যারিস্টার মহতাম কোলকাতা থেকে এসে তাকে জামিন করান। জেল থেকে বের হয়ে তিনি টাঙ্গাইলে থানা পাড়ায় শান্তিকুটিরে বসবাস শুরু করেন। কোটে জামিন শুনানী নিয়ে একটি গান রচনা করেন।

দংশিল বিষম নাগে- পরের রাগে

হলো আমার জীয়ন্তে মরণ

দারুণ ওঝা আসল সোজা -

দিল বিষম ঝাড়া আগা গোড়া-

নাগের বিষ আর রয় কতক্ষণ।

এ সময়ে তাঁর চরম অর্থকষ্ট দেখা দেয়। মামলার খরচ চালাতে তার স্ত্রীর সকল গহনা বিক্রি করতে হয়েছিল। জামিন হলেও মামলায় তাকে বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। অনেকটা সহায় সম্বলহীন হয়ে তিনি ১৮৯৪ সালে তিনি দেলদুয়ার ছেড়ে লাহিনী পাড়ায় চলে আসেন। ১৮৯৪ সালে টাঙ্গাইল থেকেই প্রকাশিত হয় তাঁর গদ্যপদ্যে লিখিত ধর্মোপদেশ মূলক গ্রন্থ "মৌলুদ শরীফ"।

১৮৯৬ সালে তিনি কিছুদিন বগুড়াতে ছিলেন। এরপর সাত বছর তিনি বিচ্ছিন্নভাবে বগুড়া, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কোলকাতা বিভিন্ন স্থানে থেকেছেন।

১৮৯৭ সালে প্রথম স্ত্রী আজিজন্নেসাকে তালাক দেন। এবছর তিনি টালা অভিনয় নামে একটি নাটক এবং তহমিনা নামে একটি উপন্যাস লিখেন যা হাফেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যদিও তহমিনা উপন্যাসটি কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। হাফেজ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেখ আব্দুর রহিম। ১৮৯৮ সালে তিনি লিখেন নাটক "নিয়তি কি অবনতি" যা কোহিনুর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোহিনুর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এয়াকুব আলী চৌধুরীর বড় ভাই রওশন আলী চৌধুরী। কোহিনুর পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়া থেকে। এরপর এটা প্রকাশিত হতো ফরিদপুরের পাংশা এবং পরে কোলকাতা থেকে।

১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনীমূলক দ্বিতীয় গ্রন্থ গাজী মিয়াব বস্তানী (প্রথম অংশ)। উপন্যাসের স্থান,কাল, পাত্রের নামগুলিও ছিল রূপক। গ্রন্থে কোন লেখকের নাম ছিলনা। বইয়ের স্বত্বাধিকারী হিসাবে লেখা ছিল 'উদাসীন পথিক'। গাজী মিয়াব বস্তানীর বিষয় ও অঙ্গসজ্জা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী বিহারীলাল

চক্রবর্তী সম্পাদিত "প্রদীপ" পত্রিকায় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখেছিলেন - "গাজী মিয়াব বস্তানী একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র, সুশোভিত, সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই এমন রস দুর্লভ। কটু, তিক্ত, অম্ল-মধুর, মধুর অতিমধুর যাহা চাও, তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর করণ রস উছলিয়া পড়িতেছে"। গাজী মিয়াব বস্তানী শেষ পৃষ্ঠায় মীর "ভাই ভাই এইতো চাই", "ফাঁস কাগজ", এ কি? এবং বাঁধা খাতা নামে চারটি প্রহসন, "পঞ্চ নারী পদ্য" নামে কাব্য গ্রন্থ, প্রেম পারিজাত এবং "রাজিয়া খাতুন" দুটি উপন্যাস প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে মীর মশাররফ সপরিবারে কোলকাতায় যান। সেখানে তিনি গিয়ে উঠেন তাঁর ছোট ভাই ব্যারিস্টার মহতাম হোসেনের বাসায়। এখানে তিনি একটি বইয়ের দোকান দেন। ১৯০৩ সালেই প্রকাশিত হয় তাঁর লিখিত পাঠ্য পুস্তক "মুসলমানের বাংলা শিক্ষা" প্রথমভাগ।

ভাইয়ের বাড়িতে দুবছর থেকে তিনি টালীগঞ্জের একটি বাড়িতে উঠেন। ১৯০৫ সালে টালীগঞ্জ হতে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ বিবি খোদেজার বিবাহ, হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ, হযরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ এবং হযরত বেলালের জীবনী। টালীগঞ্জের কিছুদিন বসবাসের পর গিয়ে গিয়ে উঠেন গোরাচাঁদ রোডের ৩৬ নম্বর বাসায়। ১৯০৫ সালের নবনূর পত্রিকায় "গাজী মিয়াব গুলী" নামে একটি রম্য রচনা যন্ত্রস্থ বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কোলকাতা থাকা কালীন সময়ে তিনি পুনরায় পদমদী স্টেটের ম্যানেজারের চাকরি নেন। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ মদিনার গৌরব, ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় মোসলেম বীরত্ব।

১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় "আমার জীবনী"র প্রথম খন্ড। ১২ খন্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির শেষ খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯১০ সাল। আমার জীবনীর প্রতি চ্যাপ্টারের নিচে গাজী মিয়াব বস্তানীর অপ্রকাশিত দ্বিতীয় অংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ "এসলামের জয়", পাঠ্যবই "মুসলমানের বাংলা শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)" এবং দুটি কাব্যগ্রন্থ "বাজিমাৎ" এবং "হযরত ইউসোফ"। ১৯০৯ সালে তিনি স্থায়ীভাবে পদমদীতে চলে আসেন। এবছর প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ "ঈদের খোতবা"। এটা আরবি ভাষায় রচিত ঈদের খোতবার বাংলা এবং উর্দু অনুবাদ। এবছরই স্ত্রী বিবি কুলসুমের মৃত্যু হয়। ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ "আমার জীবনীর জীবনী বিবি কুলসুম"। মশাররফের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মীর এবরাহিম হোসেন "বৃহৎ হীরক খনি" নামে একখানা শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আজিজমাহার এবং হিতকরীর বাইরে "হুগলী বোধদয়" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।

মুসলিমদের মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা শিক্ষা এবং চর্চার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। এপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর আমাদের শিক্ষা প্রবন্ধে লিখেছিলেন-

"বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা "বাঙ্গালা,,। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। বিশেষ সাংসারিক কাজকর্মে মাতৃভাষারই সম্পূর্ণ অধিকার। মাতৃভাষায় অবহেলা করিয়া অন্য দুই ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও তাহার প্রতিপত্তি নাই।





পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এমনকি প্রাণের প্রাণ যে স্ত্রী, তাহার নিকটেও আদর নাই। অসুবিধাও বিস্তর। ইস্তক ঘরকন্নার কার্য নাগাদে রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন”।

তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরাকী হলেও নিজেকে বাঙালি বলেই পরিচয় দিতেন। ১৮৯০ সালে তিনি “উদাসীন পথিকের মনের কথা” গ্রন্থে বাংলাকে বাঙ্গলাদেশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর সবগুলো সম্ভানের আরবিক নামের পাশাপাশি বাংলা নাম রেখেছিলেন। পুত্র কন্যাদের বাংলা নাম ছিল শরত, শিশির, সতি, সাবিত্রী, সত্যবান, সুনীতি, যুবরাজ, ধর্মরাজ, সুধন্বা, রনজিৎ।

বিয়ের সময় এক মুসির প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন জাতী হিসাবে তিনি নরজাতী, তাঁর ধর্ম মানব ধর্ম। ১৯১১ সালে ১৯শে ডিসেম্বর পদমতিতে চৌষটি বছর বয়সে এই কালজয়ী সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়। এখানে তাঁদের পারিবারিক গোরস্থানে স্ত্রী বিবি কুলসুমের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তথ্যসূত্র: রত্নবতী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিয়াব বস্তানী, আমার জীবনী, গোজীবন, বিষাদ সিন্ধু, গৌরী সেতু, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রথম আলো, মীর মশাররফ হোসেন: কবি ও মানুষ এবং অন্তর্জালের বিভিন্ন প্রবন্ধ নিবন্ধ।

--O--



Drawing: Alina



Drawing: Dibbo

জোনাকি

- কমলেশ রায়

দাদার কথা খুব মনে পড়ে। জোনাকি দেখলে দাদার কথা বেশি করে মনে পড়ে। একবার উনি কাঁচের বোতলে কতগুলো জোনাকি পোকা ভরে হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, পল বলো তো তোমার নামের অর্থ কী ?

পল তার ডাকনাম। ভালো নাম পল্লব। পল বলল, আমার নামের অর্থ হলো পাতা।

দাদা খুশি গলায় বলেছিলেন, রাতে পাতার ফাঁকে জোনাকি জ্বলে। আজ রাতে পাতার হাতে জোনাকি জ্বলবে। পলের খুশি তখন দ্যাখে কে!

সেই রাতে দাদা-নাতি মিলে অনেক মজা করেছিল। পৃথিবীর সব আনন্দ যেন ধরা দিয়েছিল পলের কাছে।

তারপর এক ঝড়ের রাতে দাদা চলে গেলেন। অন্ধকার পেছনে রেখে জোনাকির মতো উড়ে উড়ে। পলের ধারণা, যে জোনাকিগুলোকে দাদা বোতলে ভরে দিয়েছিলেন, তাদের স্বজনরাই তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

পলের বয়স আটে পড়েছে। দাদা ছিলেন তার বন্ধুর মতো। এই অল্প বয়সে বন্ধু হারানোর বেদনা ভোলা খুবই মুশকিল। পলের ছোট বৃকে একটা হাহাকার বসত করে।

ঝড় থেমেছে সন্ধ্যার একটু পরে। মা আর দাদী রান্নাঘরে ব্যস্ত। শোয়ার ঘরে বসে ছোট বোনকে কোলে নিয়ে টিভি দেখছেন বাবা। বারান্দায় পড়তে বসেছে পল। হঠাৎ তার চোখ গেল উঠানের ওপাশে বাগানের দিকটায়। আমগাছের পাশে হাসনাহেনা ফুলের গাছ। সেখান থেকে একটু পর পরই একদল জোনাকি উড়ে যাচ্ছে। পল ওঠে পড়ল। বারান্দার কোণায় কাচের বোতল রাখা। বোতলটা হাতে নিয়ে সে উঠানে নামল। সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল সে। জোনাকিরা যাতে টের পেয়ে উড়ে না যায়।

এক ঝাঁক জোনাকি উড়াল দিতেই হাত বাড়াল পল। কিন্তু ধরতে পারল না। আজ জোনাকিরা পণ করেছে কিছুতেই তারা ধরা দেবে না। তার শরীর কেঁপে উঠল। বাম হাত থেকে খসে পড়ল বোতল। চোখের সামনে সর্ষে ফুলের মতো উড়ছে জোনাকিরা। হাত আটকে আছে, তুলে নিয়ে কিছুতেই বাড়াতে পারছে না সে। তার শরীরজুড়ে তীব্র ঝাকুনি। তাকে ঘিরে ধরেছে জোনাকির দল। নিজেকে তুলার মতো হালকা মনে হচ্ছে। সে জোরে চিৎকার দিলো, দা...দা...।

ঠিক তখনই আম গাছের পাতা থেকে টপ করে ঝরে পড়ল এক ফোটা জল। ছেড়া তারের ওপর পড়তেই সেই জল এক দল জোনাকি হয়ে গেল।

জোনাকিরা দলে ভারি হয়ে আরও বেশি করে ঘিরে ধরল তাকে। পল দেখল তারের ওপাশে দাদা দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে বলছেন, পল আয়, আয়...।

--O--





ঋগ্বেদের সৃষ্টি স্তোত্র -আজিজ ইসলাম

তখন এমন কি শূণ্যতাও ছিলনা, না ছিল অস্তিত্ব।
ছিলনা বায়ু তখন, তদূর্ধ্বে আকাশও ছিলনা।
কিসের আচ্ছন্নতা? কোথায় বা তা ছিল? কার সংরক্ষণে?
তাহলে তখন কি ছিল নিসর্গের অতল সলিল সেথা?

তখন মৃত্যু বা অমরত্ব কিছুই ছিল না।
কিন্মা ছিলনা তখন রাত্রির মশাল এবং দিনের।
একক সে স্বয়ম্ভর স্বাস নিলো বায়ুহীন শূন্যতায়,
তাহলে সে একজন ছিল সেথা, ছিলনা আর কেউ।

গুরুতে ছিল শুধু অন্ধকার অন্ধকারে মোড়া।
এ সবই ছিল অনালোকিত বারিধি কেবল।
যে একজনের আবির্ভাব হল, আবরণহীন,
অবশেষে, শক্তি ও উত্তাপের উপজনন সে।

প্রারম্ভেই অবতীর্ণ বাসনা তারপর---
তাই ছিল আদিবীজ, মনে জন্ম যার।
জ্ঞানান্বেষী ঋষিগণ হৃদয় খুঁজে জানে
কার সঙ্গে কুটুম্বিতা আর কার সঙ্গে নয়।

এবং করেছে তারা মহাশূন্যে রশ্মির বিস্তার,
কী ছিল উর্ধ্বে, আর কী নিম্নে তারা জ্ঞাতসব।
মৌলিক ক্ষমতা দিয়ে গড়েছিল উর্বর বাহিনী
নিচে ছিল শক্তি, আর প্রেরণার আবরণ উপরে।

সর্বোপরি, কেজানে, আর কে বলতে পারে
এ সবার উৎস কোথা আর সৃষ্টি কিভাবে হল?
দেবতারা নিজেরাই সৃষ্টির পরের,
এর উদ্ভব কোথায় সত্যি করে কে জানে তাহলে?

সৃষ্টির আরম্ভ যেখানেই হোক না কেন,
সে, সে এটা গঠন করুক বা না করে থাকুক,
সে, যে সর্বোচ্চ স্বর্গ থেকে নিরীক্ষণ করে সব,
সে জানে-অথবা হতে পারে সেও জানেনা।

(A L Basham এর ইংরাজি অনুবাদ থেকে)

--O--



Drawing: Bella Paul

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

প্রশ্ন

যদি আজকের এই আকাশটা
দু মুঠির মধ্যে নিয়ে দিই ছিঁড়ে
তার তলায় কি আমার
পুরনো চেনা আকাশটা
উঁকি দেবে
যার আড়ালে ছিলো নিরাপদ নীল

যদি এই মাটিটা খুঁড়ে খুঁড়ে
আমার নখগুলো ছিঁড়ে
রক্তাক্ত করি সবুজ ঘাসগুলো
তার নীচে কি খুঁজে পাবো
আমার শান্তির গালিচা বিছানো
আগের সবুজকে

নদীর স্রোতে ভেসে যায়
অগুপ্তি নিখর সব দেহ
ঢেকে গেছে আমার সব পদ্ম
কাশগুলো আর সাদা নেই
লালে লাল হয়েছে
সব রক্তাক্ত
চিনতে পারো কি
লাশের জাত
কি তার ধর্ম
শুধু লাল রঙে রেঙে আছে
হয়ে এক সব রক্তাক্ত

ওগো সূর্য কেন উঠেছো
দাওনা পুড়িয়ে সোনা
করে সব
ও মাটি তোমার শুকিয়ে যাওয়া
অঙ্গে ভরণা আশার সবুজ
নদীর নীল জল
পবিত্র করুক সব আর
আমার মরা পৃথিবীটা
পাক আগের জীবন

ওগো ঈশ্বর তোমার সৃষ্টি
জ্বলেপুড়ে হলো শেষ
প্রার্থনা দেবনা তোমায়
নাও ধিক্কার নাও রাগ
আর অভিমান
ওগো তোমার নন্দনকানন
আজ হয়েছে যে ম্লান
প্রশ্ন করছি তোমাকে
আছোকি ছিলেকি কখনো।

--O--

ঈশ্বর ও একটি মানুষ

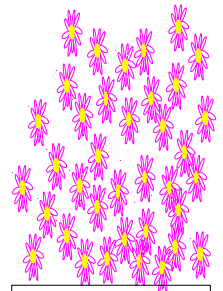
জন্ম নেওয়ার আগের মুহূর্তে
নিজেকে দেখে
ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে সে
আমি এত স্বচ্ছ কেন
রং দাওনি আমাকে

তিনি ইষৎ হেঁসে
বললেন তাকে
সাতধনুর রং নিয়ে
মেথো প্রানভরে
বেছে নিও কি রংনেবে
জীবনের এক এক ধাপে

তোমার চলার পথে
নানা রংএসে
রাঙাবে তোমায় নানাভাবে
তোমার জীবনধারাই দেবে
ভরে তোমার দেহমন
সাতরঙ্গা ধনুর রঙে

তাই আজ তুমি খালি হাতে
আর স্বচ্ছ দেহে
অপাপবিন্দু হয়ে জন্মাতে
চলেছ পৃথিবীতে
যখন সময় হবে
আসবে চলে আর
রেখে আসবে তোমার
নানারঙের রেশ
পৃথিবীর স্মৃতি ভরে

--O--







মমতাময়ী মা

-মলি সিদ্দিকা

লিখি হয়তো সেই মায়ের জন্যই
জোনাকি পোকা যেখানে
রাতের অন্ধকারে মৃদু আলো ছড়ায়
যা মৃদু, অথচ গভীর অরণ্যের মতো মায়াময়।

লিখি সেই মায়ের জন্যই
যিনি আমাকে ছেড়ে ইহকাল ত্যাগ করেছেন
অথচ রেখে গিয়েছেন তাঁর জীবন্ত প্রতিমা
যিনি মমতায় জড়িয়ে রাখেন হাজার মাইল দূরে।

লিখি সেই অনন্যা, এক মা-নারীর জন্যই
যিনি আমার লেখা অক্ষরে ফিরে পান নিজেকে
জড়িয়ে নিতে চান বুকে-স্নেহে
অশ্রু বিসর্জন দেন পংক্তিতে
মায়াবী বাচনে মুছে দেন সব ক্লান্তি-জড়তা।

যিনি থাকেন মননে
ভালোবাসার মায়ায় একান্তে
লিখি এমন হাজারো মায়ের জন্যে
যাদের অদৃশ্য স্পর্শের মহিমা
হয়ে উঠি জীবন্ত
ফিরে পাই সেই আমাকে
যাকে বিসর্জন দিয়েছিলাম হাজার বছর আগে।

--O--

এলোমেলো ভাবনা

-প্রিয়াংকা সাহা

ভাবিনা ভূত, ভাবিনা ভবিষ্যৎ
ভাবিনা ভালো, ভাবিনা অসৎ
ভাবিনা নিজেকে, ভাবিনা ভাগ্য
ভাবিনা সত্য, ভাবিনা মিথ্যে
ভাবিনা সাদা, ভাবিনা কালো
ভাবি শুধু অন্ধকারের পরেই রয়েছে আলো।

আমি আজ অন্য কিছু ভাবিনা আর
আমি আজ অন্যরকম ভাবিনা আর
আমি আজ খারাপ ভাবিনা আর
আমি আজ একাকী ভাবিনা আর
আমি আজ কষ্টকে ভাবিনা আর
আমি আজ দুঃখী ভাবি না আর
আমি আজ মরণকে ভাবিনা আর
আমি আজ পরাজিত ভাবিনা আর।

আমি শুধু আজ ভাবি হয়তো
রয়েছি বিজয়ের খুব কাছে...
শুধু আজ প্রত্যাশা নিয়ে বুকে
এগিয়ে যেতে চাই বাছ উত্তলিয়ে।

--O--

প্রত্যাখানের বেদনা

- হাফিজুল ইসলাম

আমাকে ফিরায়ে দিয়েছে শৈশবের মুখ, স্মৃতিমুগ্ধ দিন,
মজবুর জুলেখা আজার, জয়নুল আবেদিন।
রঙিন চশমা চোখে ফিরায়েছে দশরথ দাশ,
দেশান্তরি রবার্ট গোমেজ, রানওয়ের বিষন্ন আকাশ।

দুঃখের বৃত্ত ভেঙে ছুঁতে গিয়ে বন্ধুর হাত
বারবার সয়েছি কষ্টকাঁটার আঘাত
প্রত্যাখানের অভিমানের পাথর চেপে বুকে
বিরহী রাত্রির কান্না দেখেছি ঝাপসা দু'চোখে।

বন্ধুর ভালবাসা ফিরায়ে দিয়ে তোমরা আমাকে করেছো একা।
আমার আনন্দ-অভিলাষে টেনেছ লক্ষণরেখা।
আমিও বুঝেছি। বুঝেছি দুঃখ আর কষ্টের তফাত।
উপেক্ষার পাহাড় ভেঙে তোমাদের কাছে আর পাতিব না হাত।

তার'চে ভালো যাই ফিরে যাই
ফুল পাখি আর নদীর জলের কাছে
যাদের কাছে আমার অনেক গল্প জমা আছে।
পাখির কাছে আছে জমা স্মৃতির পরশ পাথর
দুর্বাঘাসে ঢাকা আছে মায়ার রঙিন চাদর।
ভালবাসা জমা রাখুক হাজার নদীর ঢেউ
এরাই আমায় রাখবে বুকে ফেরাবেনা কেউ।

--O--

মার্ত্ত বন্দনা

-শিশির ঘোষ

শরৎকালে তোমার আগমন মাগো হাজার বছর ধরে
তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পরে মাগো এলে আমাদের ধারে
পূজা হয়তো মার প্রতিটি বাঙালীর ঘরে ঘরে।

তুমি নও মুসলিম, নও হিন্দু, নও বা বৌদ্ধ খৃস্টানের,
তাইতো দেবী তুমি সার্বজনীন।

তোমায় পূজিব মাগো
তাই অধীর হয়ে রই
পদধূলি পেলে মাগো তোমার, বিশ্ব করবো জয়।

মানব রূপি অসুরগুলি শয়তানের বংশধর
মানবতার ধ্বংস করে চলেছে সব সময়।

তোমার কাছে প্রার্থনা মাগো
তোমার আঁচল তলে
বিশ্ববাসীদের রক্ষা করো তোমার
দিব্যজ্যোতি দিয়ে।

--O--





সোনার ছেলে

-তন্ময় দেবনাথ

ছোট্ট বাবা সোনার ছেলে
ধাক্কা ছাড়া পরে হেলে
টলতে টলতে হোঁচট খেলে
করে শুরু কান্না।

দৌড়ে এসে বাবা বলে
ছোট্ট বাবা আসো কোলে
মাও তখন আসে চলে
ফেলে সকল রান্না।

দিদি তখন বলতে থাকে
উচ্চ গলায় মাকে ডেকে
ছোট্ট ভাইকে ফেলে রেখে
করছো শুধু রান্না?

মা বাবা আর দিদি পেয়ে
কান্না টান্না ভুলে গিয়ে
ছোট্ট দুটো হাত বাড়িয়ে
করতে থাকে বায়না।

দিদি তখন খুশী হয়ে
মাটির পাখি হাতে নিয়ে
ভাইয়ের দুঃখ মুছে দিয়ে
বলে নে তোর ময়না।

ময়না পেয়ে সর সরিয়ে
কোলের থেকে নেমে গিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে টলমলিয়ে
ঝড়ায় হাসির ঝরণা।

--O--

বৃষ্টি প্রলাপ

-তানজিম আফরোজ

যখন বৃষ্টি নামে শহর জুড়ে
রাতের বৃকে উজাড় করে
কৈ যে লুকাই মন রে আমার!

মন উড়ে যায় মেঘের বাড়ি
ঘুমের সাথে দিয়ে আড়ি
কৈ উড়ে যায় মন রে আমার!
রাত্রি খানিক গভীর হলে
শহর ডোবে অঁখে জলে
ঝামঝামিয়ে কাঁদে আকাশ।

ও আকাশ তুই এমন কেন?
অভিমानी এক মেয়ে যেন,
এত কেঁদেও মেটেনি আশ?

কাঁদবি যদি উড়া আঁচল
খোলা চুলে উর্বশী ঢল
বিজলী খেলুক আকাশ চিড়ে!

সর্বগ্রাসী প্রাবন আসুক
শহর না হয় বানে ভাসুক
তবেই কি মন ভরবে ওরে!

ওরে আমার অভিমानी
শোনরে কথা একটুখানি,
কৈ চলে যাস ছটফটিয়ে তুই?

নাই যে ঘুম চোখের পাতায়
জেগে আছি একলা একাই
ক্লান্তি আসুক, তাতেই আমার সহ!

--O--

ভব দুর্গা

- প্রিয়াংকা সাহা

তামিসক রক্তের মহিষাসুর
বধের তরে...

সকল শক্তির আধার হয়ে;
দুর্গা এলো মর্ত্যে...

আহা! কী জ্যোতি!!!
অগ্নি বরা ত্রিশূল বাণে....
মুহূর্মুহু ধ্বনিতে উদ্বেলিত
দেব-দেবী আর মনুষ্য...

অবাক বিস্ময়ে
হেরি আলোক জ্যোতি...
মহাকাল হলো
দুর্বার সেই নারী শক্তির মহাসাক্ষী...

বহুর বহুর তাই উমা
পূজিত হয় এ অবনী পরে...
তবে কেন ভবের দুর্গারা
রয়েছে এখনো শেকলের বেড়াজালে।

ভাস্কর এ বেষ্টনী
ভাস্কর সকল অহম...
সকল কুসংস্কারকে দেখিয়ে বৃদ্ধাংগুলি
পক্ষীকুল পাখ মেলিয়া উড়ুক গগন পানে,
মাগো তোমার পূজা সেদিনই সফল হবে
ভবদুর্গাদের মুখে যেদিন ফুটেবে হাসি ভবে।

--O--

বধ

-দিপান্বিতা বিশ্বাস

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল ভাদ্রও যায় যায়

নীল আকাশে চেয়ে মোর নব সুর গায়।

ম্লিঙ্ক সকাল শিউলি সুবাস চারিদিকে

দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁশের ঢেউয়ে হৃদয় আমার-নাচে।

মায়ের হাতের নাড়ু আর মুড়ি-মুড়কি দই

পাড়া পড়শি হিন্দু-মুসলিম করবো হৈ চৈ।

হিন্দু না ওরা, মুসলিম কিম্বা কে অন্য জাত

কোনো ভেদ ছিল না তখন উৎসব যেন সবার।

এখন মায়ের আগমনী এলে ভয়ে ভয়ে থাকি

জ্বলছে আগুন, পুড়ছে মানুষ শক্তিত হই আজি।

সহিতে পারি না যে পিতৃহীন আর বিধবার অশ্রুজল-

এমনি করে জানি না আর চলবে কতকাল।

অসুর বধ হয়েছে অনেক এবার সাম্প্রদায়িকতা বধ কর

তোমার সন্তানদের তুমি আবার নিজেই রক্ষা কর।

--O--



Drawing: Joyoti





খলিলুর রহমানের দুটি কবিতা

আজীবন-যন্ত্রণা

জগতের অলক্ষ্যে একদিন হয় যার সূচনা
শুধু মা-ই বোঝে তাকে পৃথিবী দেখানোর কী যন্ত্রণা।
ক্ষুধার পূর্বেই যে শিশুর খাদ্য হয়ে থাকে রান্না
কে জানে জন্মের পরেই কোন যন্ত্রণায় তার কান্না।

নিশ্চিত শৈশব-কৈশোরের চাওয়াটা হোক যতই সামান্য
যন্ত্রণা অপরিসীম, যদি কেউ ভেবে থাকে তা নয় দান্য।
চোখের আড়াল হলে মা - পরম নিশ্চিত আশ্রয়স্থল -
কার সাধ্য বোঝে কী যন্ত্রণা প্রকাশ করে দুচোখের জল।

হৃদয়কে বুঝানো আর না বুঝার যে যন্ত্রণা
তাই নিয়ে যৌবনে দুর্বোধ্য অদৃশ্য প্রেমের মন্ত্রণা।
প্রেম-জয়ী হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বড়ই ক্ষণস্থায়ী
চাওয়া-পাওয়ার হিসাবের অমিলে মনে হয় সমস্ত পৃথিবীই দায়ী।

তারপর মনে হয় একদিন
সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার আজীবন হিসাব বড়ই অর্থহীন।
কে কবে চলে যায় চেনা নদীর অজানা ওপারে,
হয় তাই প্রতিদিন শোনা
আর স্মৃতির যন্ত্রণায় বসে বসে নিজ বুকে ঘড়িটার টিকটিক গোনা।

মাঝ বোশেখের নদী

ও নদীরে! তোর বুকে নীল পানি
তার উপরে ভাসে যে জার্মানি
আমি কোথায় দেবো ডুব?
তোর বুকে যে নাইতে আমার ইচ্ছে করে খুব।

মাঝ বোশেখের তপ্ত-ক্ষরা দুপুর
জলশূন্য খাল, বিল আর পুকুর।
শুকনো মাটি কাঁদে জলের শোকে
মধ্যদিনের রোদ্র নাচে চোখে।
গায়ের চামড়া ঘামের নুনে
পুড়ছে চিটেগুড় আর চুনে -
তোর বুকতে ডুবে ধুতে ইচ্ছে করে খুব
বল্ দেখি ও নদীরে তোর কোথায় দেবো ডুব?

জল পিয়াসি চাতক পাখি
উর্ধ্বে চেয়ে মরছে ডাকি।
মেঘ বালিকা যায় পালিয়ে
দুষ্ট হেসে খিলখিলিয়ে।
শুকনো পাতা নুপুর পায়ে
নেচে ঘোরে দমকা বায়ে -
তোর বুকতে নাচতে আমার ইচ্ছে করে খুব
বল্ দেখি ও নদীরে তোর কোথায় দেবো ডুব?

আসবে কবে আষাঢ়-শ্রাবণ
দুকুল ভেসে নামবে প্লাবন।

ছল ছল তোর বুকের জলে
ডাকবি রে তোর অঁথে তলে -
যেথায় আমার ডুবে যেতে ইচ্ছে করে খুব
সেদিন কবে যেদিন দেবো তোর বুকতে ডুব?

--O--

অবিমিশ্র প্রকৃতি মম আবাস

-অনিন্দিতা ব্রহ্মী

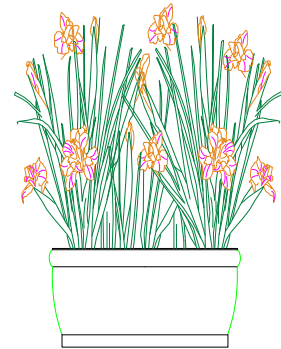
পাতার উপর বিন্দু শিশির একটু একটু করে.....
ওই দেখো না সবুজ সবুজ আলোর ছোঁয়া ভীষণ মুগ্ধ করে।
শক্ত ডালের ভাজে ভাজে নিঃস্ব আঁখি তাকিয়ে রয় ...
চুপিসারে আলতো রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দেবার অপচয়।
ঘাসের সাথে আমার আছে নিবিড় কিছু বন্ধন..
চলার পথে শুনে থামি চেনা সুরের স্পন্দন

মুগ্ধ মণি সাগরটা যে করছে আরও আপন...
শেষ হবে না শ্রোতের থমকে যাওয়া আগমন।

খুব কি বেশি পাখির ডানায় মেলছে তুমি উড়ার প্রবণতা?
আকাশ পানে খেলতে থাকা স্মৃতির সমঝোতা।
তবুও তারার ছোটোছোটো দৃষ্টি হয়ে নামছে
ধরবে লাল স্পর্শী মাটি
অপেক্ষার প্রহর মিষ্টি ভেবে গুনছে।

হোক না সবুজে নীলে -- একাকার
সুর সমবয়
যেন অপলক নজরে তাকিয়ে থাকার আকুল সংশয়।।
বৈঠা টেনে গড়িয়ে এগোনোর আমন্ত্রণ ...
প্রসন্নতা
চলছে বেড়ে করছি এক নিছক সমর্থন।।

--O--





মিলনমেলা

-ব্রত রায়

অংশগ্রহণ ছিল সবার, সবাই ছিল পাশে
 সর্বজনীন উৎসবেতো সর্বজনই আসে।
 কেউ তুলেছে চাঁদা
 কারওর আবার কাজ আছিল মণ্ডপে বাঁশ বাঁধা।
 কেউ দিয়েছে আইডিয়া, কেউ থিম
 কেউ পেড়েছে আস্ত ঘোড়ার ডিম!

ওরা শুধুই বাক্য বাগিশ কাজ করেনি কিছু
 অকারণেই ঘুরত শুধু সেক্রেটারির পিছু।
 কেউ নিয়েছে পাল মশাইয়ের ভার
 কেউ গড়েছে ঢোকার মুখে সুদৃশ্য এক দ্বার।

কেউ এনেছে বাজার-সদাই করে
 কেউ গৈথেছে ফুলের মালা পূজোর কদিন ভোরে।
 কেউ কেটেছে ফল
 শুদ্ধ মতে কেউ এনেছে জল।

চতুর্দিকে জ্বালিয়ে দিয়ে বাতি
 কেউ দেখালো আলোর তেলসমাতি
 কেউ এনেছে মাইক
 কেউ ডেকেছে বরকন্দাজ, পাইক।

কেউ করেছে সাজ সজ্জার কাজ
 ওরা সবাই বেকার দেখি আজ।
 কেউ এনেছে ঢাকী
 আরও অনেক কাজ আছিল, কাজ বুঝি কম নাকি?
 সেসব কাজেও ব্যস্ত ছিল কেউ
 কাজ ফুরোলো আজকে সবার চোখে জলের ঢেউ।
 কেউ করেছে তত্ত্বাবধান সব
 নইলে হত সবই অসম্ভব

আজকে আলো জ্বলছেনা আর, বাজছে না আর ঢাক
 মিলন মেলা ভঙ্গ হলো, ফুরিয়ে গেল জাঁক।
 মণ্ডপে আজ যায় তাকানো? জায়গাটা আজ ফাঁকা
 ভাঙাগেনা কিচ্ছু আমার, বুকটা করে খাঁখাঁ।

--0--



Drawing: Drik

বাঙালির দুর্গাপূজা

- প্রবনীল মণ্ডল

দুর্গাপূজা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি ধর্মীয় উৎসব।
 দুর্গাপূজা মানেই চারদিকে যেন এক উৎসব মুখর পরিবেশ। সকলের
 মধ্যে সৃষ্টি হয় দারুণ উত্তেজনা, উদ্দীপনা, উৎসাহ ও হৈ-হুলোর।
 সকলের মনে জাগ্রত হয় এক অপরূপ প্রেম- ভক্তি। লেখক যেন
 এসময় পান লেখার নতুন আগ্রহ, কবি যেন পান কবিতা লেখার
 নতুন ছন্দ ও সুর।

শরৎকালে ভাদ্রের শেষে আশ্বিন মাসের শুরু পক্ষে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত
 হয়। শরৎকালে সমগ্র প্রকৃতি যেন মায়ের আগমনীকেই বরণ করে।
 নদীর তীরের কাশফুলগুলো নীল আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে
 থাকে। শিউলি ফুলের সুবাসে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। মন্দির-প্যান্ডেল
 থেকে শুনতে পাওয়া যায় ঢাকের বাজনা।

দুর্গাপূজা এলেই মনের ভিতরে অনেক জল্পনা- কল্পনা হতে থাকে।
 দুর্গাপূজায় এবার কি কেনাকাটা হবে, কোথায় পূজা দেখতে যাওয়া
 হবে, এবার পূজায় কোন থিম সবচেয়ে সেরা হবে, এবার পূজার
 মেলায় কি বসবে ইত্যাদি সব বায়না ও কল্পনা। শিশু-কিশোরেরা
 পূজা ছাড়া অন্য কোন কিছুতে মনোযোগ দিতেই পারেনা। কমপক্ষে
 দুই থেকে তিনসপ্তাহ আগে থেকে পূজার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়।
 সকলেই তাদের পছন্দের শার্ট, প্যান্ট, ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি ক্রয়
 করেন। এছাড়াও পূজার অনুষ্ঠানের জন্য ও নিয়মিত মহড়া
 (rehearsal) চলে।

দুর্গাপূজা শুরুর আগে একটি বড় আকর্ষণ মহালয়া। সেই ভোরে রাত
 কাটতে না কাটতেই দ্রুত ঘুম থেকে উঠে পরিবারকে নিয়ে
 টেলিভিশনের সামনে বসে মহালয়ার দেবী- বন্দনা শোনার যে এক
 ভিন্ন আনন্দ তা বলে বোঝানোর নয়। মহালয়া না হলে যেন মনে হয়
 আগমনীর সূচনাটি যেন ঠিক ভাবে হলনা। মায়ের মুখে শুনেছি,
 আগে রেডিওতে নাকি মহালয়া শোনা হতো এবং সেটি ছিল নাকি
 আরও বেশি আকর্ষণীয়। দেবীপক্ষের আগের কৃষ্ণপক্ষকে বলা হয়
 অপরপক্ষ, আর এই অপর পক্ষের অমাবস্যা তিথিকে মহালয়া বলা
 হয়। মহালয়া উপলক্ষে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার
 করে থাকে।

পুরো ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত মহাধুমধামের সাথে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত
 হয়। সকালে সকল নারী ও পুরুষ স্নান করে দেহ-মনকে স্থির ও
 পবিত্র করে মণ্ডপে মায়ের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিতে আসেন। আর সন্ধ্যা
 থেকে শুরু হয় মানুষের বিপুল আনন্দ। পথে লক্ষ্য করা যায় বিপুল
 সংখ্যক মানুষের ঢল। ধর্ম-বর্ণ- গোত্র নির্বিশেষে সকলেই এই
 আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি মানুষ তাদের পরিবার ও
 আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নতুন পোশাক পরে পূজা দেখতে বের হয়।
 প্রতি বছর পূজার মেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেলায়
 কারিগরদের হাতের তৈরি নতুন সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। দেব-দেবীর
 মূর্তি, প্রদীপ, শিশুদের নানা ধরনের খেলনা ও নারীদের নানা ধরনের
 সাজ-সজ্জা সামগ্রী (cosmetics) মেলার বিশেষ সংগ্রহ। মেলা
 জুড়ে চলে মানুষের হৈ-হুলোড়, নাচ, গান ও খাওয়া-দাওয়া।
 সবশেষে পূজা শেষ হয় সিঁদুর খেলা আর বিসর্জনে মধ্য দিয়ে।





যারা দেশের বাইরে বসবাস করেন, তারাও যথাসম্ভব চেষ্টা করেন নিজেদের এই সংস্কৃতির আনন্দটিকে পরের প্রজন্মের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার। এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, পিতার সুবাদে আমি ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আসার সুযোগ পাই। বেশকিছু সময় এরই মধ্যে অতিবাহিত হয়। আর দুর্গাপূজার সময়ও এসে যায়। আমার মন যেন বড়ই খারাপ হয়ে আসছিল। শুধু মনে হচ্ছিল, এ বছর আর ভাই-বোনদের নিয়ে পূজা দেখা হবে না। ফোনে কথা বলে জানতে পারলাম, সে বছর বাংলাদেশও পূজার ভাল কোন প্রস্তুতি নেই। মনটা তখন বড়ই খারাপ। করোনার (Covid-19) জন্য সারাদেশ তথা বিশ্বে তখন লকডাউন ও রেস্ট্রিকশন (restriction)। তখন সকলেই প্রায় নিশ্চিত ছিল, দুর্গাপূজা সে বছর হবে না। তবে সেই বছর অস্ট্রেলিয়ার BSPCI (Bangali Society For Puja and Culture Inc) এর আয়োজন আমার বেশ আনন্দ দেয়। সকল সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখে তারা এ আয়োজনটি করে। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, নাচ, নাটক, কবিতা-আবৃত্তি – সকল কিছুর আয়োজন তারা করে। আমকেও গান ও নাটক করতে বলা হয়। এজন্য আমি তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে সকল শিশু বা কিশোররা বিদেশে বড় হচ্ছে, এসকল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাদের অতীত প্রজন্মের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে সহায়তা করবে।

বাঙ্গালির দুর্গাপূজা এভাবেই নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় ভক্তরা তাদের মন-বাঞ্ছা মায়ের কাছে জানান এবং কল্যাণ কামনা করেন। বাঙ্গালির দুর্গাপূজা বাঙ্গালি হিন্দুদের একটি বিরাট ঐতিহ্য। হাজার বছর ধরে এটি পালিত হয়ে আসছে। ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজায় আমরা যেন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এই আনন্দ উৎসবে অংশ নিতে পারে।

--0--



Drawing: Bisshay

The Adventures of Jeremy Bishop

-Ruwan Barua Dibbo

“Finally, peace at home.” Jeremy sighed happily. He felt very exhausted, as he had sweat streaming down his face, body and face slumped down of exhaustion and dehydration and desperately gasping for breath like he was breathing for the last time of his life; but honestly, Jeremy had no reason for tiredness because he had not even moved out of his rocking chair!

Before he could even take a little power nap, his furnace started blazing and majestic eyes glared at him, “What are you? Are you going to take me somewhere?” Asked Jeremy curiously with a rather frightened face. Suddenly the green, glimmering eyes levitated through the balcony and then headed to the luminous night sky; which it turned into a mystical, blazing phoenix waiting for Jeremy. Once Jeremy hobbled outside the phoenix told him, “Hop onto me, I will take you to the Kingdom of Fantasy. Come on.” “Ok fine, hopefully for good reason; anyways, what is the King-whooooooooo! What are you doing!” shouted Jeremy as he saw the world twirling around him? The phoenix did all sorts of flips, moves and somersaults until Jeremy was so dizzy, he was put into a life-long trance which soon faded away because of the phoenix’s *scorching feathers*.

The heat radiation from the phoenix’s scorching feathers entered into Jeremy’s eyes which made the trance effect fade away

After a while, Jeremy had arrived at the Kingdom of Fantasy where he was awaited by the queen, who was named Queen Blossom. She soon requested Jeremy to go and find the Fairy Mask and take a special bag with endless supplies to make sure that he would not be empty when he had to face living things. She also warned Jeremy that there are lots of non-living and living things which are surrounding the Fairy Festival Mask. Since Jeremy wanted to keep the queen (who he barely even knew) pleased, he hopped onto his temporary horse and was already galloping to the horrifying Forest of Black Death in order to retrieve the Fairy Festival Mask. In being there, Jeremy had come across a dangerous, terrifying,





red-eyed shadow whom he couldn't even see, which was a huge disadvantage to him. Fortunately, Jeremy quickly pulled out a magical shadow sucker out of his bag and then sucked the harmful shadow into the depths of the shadow sucker.

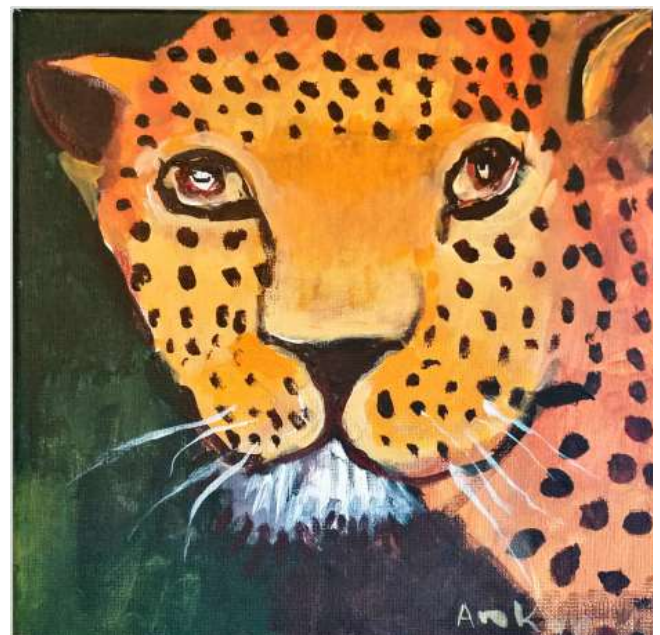
Meanwhile, someone else named Rob was galumphing through the forest terrified of what would happen. Soon, when he didn't even expect it, Rob bumped into Jeremy. "Wh-who are you?" trembled Rob, "please don't hurt me." "Don't worry, I won't hurt you. Do you want to come with me on my journey?" asked Jeremy gallantly. "Sure! It's been a long time since I met anyone as I was lost in the forest for a few days!" responded Rob cheerfully. Now the two were already walking towards the Darkened Cave, where the Fairy Festival Mask was. As they headed in there, they lit a flaming torch and came to a halt. Jeremy scanned the area (while Rob was biting his fingernails of fright) and found a pack of wolves staring at them both with drool-like waterfalls pouring down their mouths and fangs. Jeremy whispered to Rob, "Stand still and don't move. Also, do not make a tiny peep." But Rob couldn't handle it, he opened his mouth and screamed, *scream*. Jeremy slapped his forehead embarrassingly, seized Rob's hand and made a swift dash for safety, but the wolves chased after the two until Rob and Jeremy were cornered. The pack slowly crept towards Rob and Jeremy, until Jeremy managed to pull out immense pieces of meat from his bag with endless supplies and threw them randomly for the wolves to find and feast on.

Although the duo felt exhausted, they still headed to the cave and went inside without being disturbed by anything. In being there, Jeremy located the Fairy Festival Mask which was gleaming and picked it up from the crooked, rocky floor. Jeremy and Rob soon ran out the cave with the Fairy Festival Mask in the safety of their hands. After a few hours, yet another problem came! They did not know where they were and they were stuck in sticky quicksand! But worst of all, the bag was with Rob who was so terrified that he could not even move a muscle! Soon, (after a few hours at least) Jeremy managed to calm down Rob and then Rob courageously

lifted the bag up from the quicksand and then did he pick out a small but super strong drone to fly them out. In no time, the duo with the help of the bag settled a journey back to the Kingdom of Fantasy with no distractions and no harm. Once Rob and Jeremy came to the gates of the Kingdom of Fantasy on their temporary horse, they then rushed towards Queen Blossom and handed her the Fairy Festival Mask. Queen Blossom was very happy to have the Fairy Festival Mask as well as seeing Jeremy come back with a new friend. Queen Blossom now announced, "I declare that Jeremy Bishop and Rob shall become our royal knights and serve us whenever we need support." After hearing that delightful news, Rob and Jeremy high-fived each other and both asked Queen Blossom, "How do we go home?" Queen Blossom heard the question and gave the two a magical rose-looking ring, which would make Rob and Jeremy float into their houses.

Rob said to Jeremy, "See you later when Queen Blossom needs us!" Jeremy responded back, "Yeah, we'll see each other again." Soon after a mere moment Rob was back in his home, while Jeremy also was back in his home still back in his cozy rocking chair near the same looking furnace with the same blazing flames. Jeremy finally got to have a rest, in which he took a nice power nap, ZZZZZZ.

--O--



Drawing: Ankan





Holiday Visit- WA Museum Boola Bardip - Dipannita Saha

Chirp, Chirp, CHIRP! I stumbled of my bed. "MORNING BIRDS!" I screamed ☺, it was a new day and a new light for me to explore the world..... just kidding it was the day I was going to visit the WA museum and shop for 3 clothes. I did my usual routine like any other morning and waited until it was time to go.

Drik, Mum & I were waiting for the bus which by the way came on time, when we found ourself in a train station we hopped on the train like 3 hopping rabbits (which by the way is an animal) and magically appeared at the WA museum! All of us then walked like serious soldiers and marched up the escalator.

We altogether went to a part of the building which was called Rio Tinto and saw *unbelieva!* E.g. (example for) old fashion cameras, creepy dolls made out of straws, a cool/ craving technology car game which was *amazing!*

Then we stumbled upon another part of the building called *Reflection* and saw, I could saw interesting things. There were stuff like a big 3D map of the world, voice calling stories from long, *long* time ago. The worlds WHITEST sand, 1. Hyams Beach, 2. Clear water, 3. Bora Bora & 4. Goody Beach.....

Drik, Mum & I then breathlessly climbed up the staircase with exhaustion and *finally* made it to the next part of the building, it was a room with *all* the changes that happened in the world and stuff like that. There were straw being humans, animals, helicopters and more! There was doors on the wall with facts about animals and nature, & let's not forget there was a very, VERY weird boulder stuck on chains in the room which was, I could say interesting.

We all together forced ourselves to go to the next room with an i'm okay look and went inside with tiredness, I could say this was my *favourite* room! We saw dead animals stuck in cages, there were little boxes that we could smell and it smelt like eucalyptus leaves (which koalas eat).

There was another box but several ones that smelt like all the seasons in long, long time ago, they smelt horribly *disgusting!*

After *that* journey we went to MYER to by 3 dresses, we then found a *really* for me to wear and found a few others that I was *okay* with. There was the checkout lady who was generous to us but took *forever* to scan 5 dresses we bought, (yes, yes, I'm aware that we went a bit ahead on getting dresses) but yea, *and if it was taking forever the food counter will be closed by then!* After the lady took years scanning just 5 dresses all of us ran, and yes we *ran* to the food counter but found it closed.

Mum then remembered that there was many food shops on the side of the city. We then again yes, *ran* again and there laid HUNGRY JACKS! We all ate a chocolate & caramel Sundae and a burger each. I had an *incredible* experience with my family and am looking forward on seeing things that we might have missed in the museum and more clothes ☺.

--0--



Drawing: Srija





Message in a Bottle

- Joyoti Sarker

“Catch Lola!” shouts Grace. Grace and Lola were the very best of friends and they were playing at the beach. They were playing catch when they heard a noise. They thought they could hear someone shouting help from far away but they just ignored it.

“Catch Grace!” said Lola happily.

But when Grace went to get the ball she unexpectedly stepped on something.

“Ow!” cried Grace.

“Are you okay?” asked Lola.

Grace told her that she had stepped on something hard. Grace and Lola dug until they found something. It was a message in a bottle. The girls were so excited. They showed Grace’s grandad because he was Captain Beardo. When Captain Beardo saw he opened the bottle straight away a saw a message. The message said SOS on it. Captain Beardo said they must save the people who sent the message. The next day they set off to sea.

They were sailing on the ocean for hours until finally they saw something. Then Grace spotted a big island with writing in the sand. It said in the sand SOS in huge letters. They quickly sailed towards the island. On the island they saw 3 divers waving their arms around to get someones attention. The girls and Captain Beardo got off the boat and sat on the sand with the divers. The divers told them everything that happened and Grace told them that they had found the message. Then they all started sailing back home. On the way home they were all eating after the long journey. Then they heard a roaring engine behind them. It was a pirate ship. The pirate ship was chasing them. Captain Beardo had an idea. The girls and divers clicked on their seatbelts and Captain Beardo hit turbo boost. One of the pirates was at the very front of the pirate ship and jumped onto Captain Beardos ship. The pirate ship had been left behind but the pirate was still on Captain Beardos ship. The girls froze in terror. Captain Beardo told one of the divers to steer the ship and he fought the pirate. Their swords tapped as they fought.

Captain Beardo was struggling to fight but then the girls took off their seatbelts and helped him to fight. They got their water bottles and started hitting him. Then they put the picnic basket on the pirates head. Then Captain Beardo pushed the pirate off the ship. They sailed back home in peace. When they went home they got to be on the news for finding the 3 pirates. The girls had just had the best adventure ever. They were so happy and told everyone about their amazing day!

--O--

About Puja

-Alina Ghosh

Puja is all about to spiritually celebrate an event. The word “Puja” is “Sanskrit” and means honour and worship. For me, Puja is all about good food, new dress and lots of fun with my friends. When Puja comes, we start practicing singing, dancing, playing instruments, drama etc. to perform on the stage.

In the morning on Puja day, we all dress up nicely and go to the Civic centre. Over there, we all meet each other and enjoy the celebration. After enjoying the yummy lunch, we come back home to get ready for the cultural night and stage performance.

On the cultural night, we dress up in our traditional performance outfits to get ready to go on stage. More than 200 people come to enjoy the puja. People also come to watch our performances. When I am waiting backstage, I get over excited. I cannot stay still! While I am performing, I feel like I am famous.

Every time people perform on stage, everyone in the audience appreciates them. After the show, people enjoy the homemade food dinners. At the end of the puja, all mums play with the Sindoor, which is fun. The Puja night ends with the high voltage dance and we hug our friends as an award.

--O--





The Bird That Wanted to Become Human

-Bella Paul

One day lily came to feed the bird that was sitting in a tree. Lilly had a full hand of bird seeds and placed her hand towards the bird, but the bird was scared. The bird thought she might harm her, so the bird flew away. The bird was on the fence and thought, "It would be easy for me to get tons of food and do anything I want if I was a human!"

One day, the bird was flying, and a wishing well caught her eye. A few kids were throwing coins in it to grant their wishes. Then she had an idea. What if she did the same? Her wish could come true, and she could finally become human! So, she soared across the valley looking for a coin and that was when light shimmered into her eyes. She instantly soared down for it and grabbed the coin with the pointy beak and went straight to the well.

As soon as she got there, she placed her coin into the well, "I wish I was human!" she said. After a few days, she woke up with fingers and legs! Her wish came true! But there was a problem. She slept upon a tree, and she couldn't fly down. Suddenly, she slipped and bumped her head at the bottom of the tree. She was free.

Every night passed by as she wondered under the trees. She had all the snacks without being grabbed. But there was a problem. She had nowhere to go! She wanted to meet all her animal friends at the zoo, but you needed a ticket. She didn't know what to do and other people thought she was weird. So, she finally gave up and wanted to be a bird again.

The other night, she looked up and saw a shooting star. She had to make her wish! "I wish to become a bird again!" but nothing happened. She was very upset. Being a bird was easy and being human is too hard.

The next day. She opened her eyes. Her feet, legs and hair were gone! She was a bird again!

--O--



Caterpillar Cam

-Irfan Galib

Epilogue

Previously caterpillar Cam had been accused of stealing 15kg of gold while driving a speeding Ferrari car which had also been listed as a stolen item. When he went to his jail cell at the middle of night, he couldn't sleep but then a figure who looked exactly like him appeared he looked at it but the next second he was out cold.

Story

"Cam! Cam!" Called chief Spidey "It's time for your second trial in case you didn't steal the things which you were accused of." He woke up with a groan he was very tired and he saw that there was a bandage wound around his leg. He got up and went to the court. The video was showing that he was in a Ferrari car and the things happening were little's fifty- eight court case, Shayna Snails lunch and Cam's day off.

When they asked him what he was doing on his day off he said "I was getting ready to play in bug war round 4 against Mark millepede." So, the judge checked his video of what he did on his day off (it is a rule that if you have a day off and you are in the Leaf- Leaf-Leaf police you have to take a video in case you do something against the law). The judge saw that he was going to "Sports R Us" (the best sport shop in town).

The judge saw that it was one of the shops robbed and immediately though that Cam was guilty of stealing the bug war equipment to win. He couldn't be sure, so he told Cam, he could go, but he had to come here once a week. Cam agreed.

Finally, the Bug War round 4 commenced Mark was sliding around the ring but Cam used the ankle pin strategy and he won the round by pinning him onto the wall until he gave up. He was very happy with his win against the 16-time champion and 38-time runner-up.

When he qualified for the semi-finals, he was paired up with the defending champion Bally bee he was completely surprised that he won. The game started when Bally used his sting to paralyse Cam for 10 seconds he was about to lose





when he was freed from paralysis and he smacked Bally onto the ground to win.

At the second semi-final between Inka and Sam Silverfish Sam was knocked out after 5 seconds as he was on the bar but Inka smacked him off the bar really hard and Sam also broke his leg and arm.

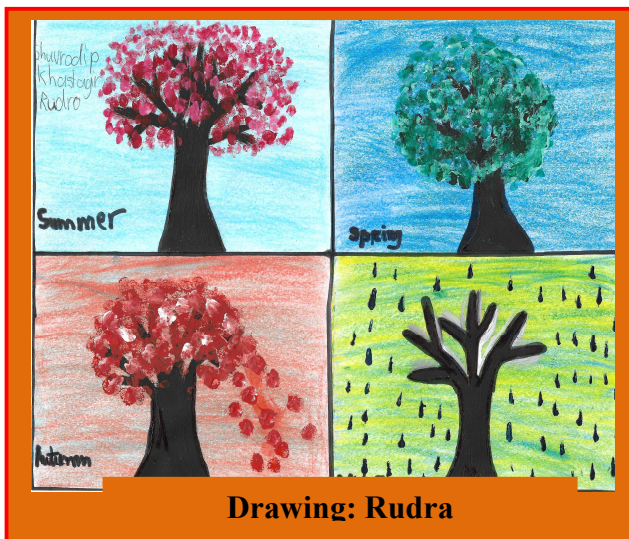
Cam was called to the court because he was again suspected for another crime. The judge checked his video and it showed he was innocent. But he was taken to jail in case he somehow made him look innocent by changing the camera.

After 4 weeks he was confirmed innocent. Two days later he went to play the final between him and Inka the game started when Cam was about to lose but he hit Inka really hard! He hit him so hard that all of the stuff stolen including top quality bug war equipment, lots of money at least 400 billion dollars and, a tactical strategy board fell out of his pocket.

The stolen Ferrari car was spotted by ref Liam Locust while going home and the number plate was glued on. The number plate also said INKA.STRIKES while the original said FOR.AARON. After Inka was arrested Cam saw that on the ground was a caterpillar costume, he remembered that time where the figure that looked like him who came at the middle of the night, he thought that it was Inka.

After all the drama Cam was announced bug war champion. Inka was banned from it. Our hero was restored to his former glory.

--O--



Drawing: Rudra

- Elora Galib

My heart was pounding, thump! Thump! Thump! I clenched my sweaty palms into fists. "It's now or never," I told myself.

"Going once, going twice" ... I couldn't stop myself, before I had time to say a million dollars, my arm jumped into the air... "SOLD!". A loud thump echoed through the hall, causing me to think about what I had just done. This is was a disaster!

A lady called "Wow! The rarest, oldest, stamp sold for... A million dollars!" A MILLION DOLLARS!!! What had I just done? Was I going to go broke?

Lost once again, in my own thoughts, another lady, who was selling the priceless stamp on auction called. "PAY up you!". That was it, I was officially dead. What was I going to do? I remembered that letters always calm me down so I was going to write one.

I entered my grand office, and sat down, I found my fountain pen and an ink bottle and began to write...

*'Dear Mum,
I think I have done the silliest thing in the world;
I have bought a \$1,000,000 dollar stamp at an auction. I mean A MILLION dollars is too much.
Mum, I need your help, I feel like an ice cream melting in the sunshine, I really think I am broke.
I wish I had never attended the auction, then I wouldn't feel like this. Please help me Mum, any advice or letter is fine.*

*Love, your son
Ashton.'*

I reread the letter twice, then I placed a pretty, floral pink stamp on the envelope. I stared at the priceless piece of junk. Bleugh, disgusting, what had I gotten into myself now. I proceeded to write a letter to a buyer of a house on sale. Without looking I placed the closest stamp to me on the envelope. After a few minutes, I walked to the post stop, gazing at the bustling shops of London, knowing that I was going to be in the headlines.

When I entered the post office, the lad at the front greeted me with a gruff voice.





“Just these two,” I told him. He looked at the envelopes with the addresses on them, his eyes wandered to the stamps.

“Are you sure about this?” he asked. Too surprised to ask why, I said yes. The letters went down a pipe, ready to be delivered. I paid the man some money and set off on my day, still sulking.

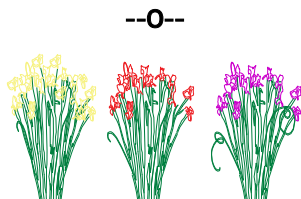
When I got home, I realised that my stamp was not there. A still silence made me realise what I had done.

“NOOOOOO!!!” an ear-piercing shriek erupted like an earthquake.
I had lost my stamp!

*‘Dear Mum...’
Meanwhile, at a poor little girl’s house a cheer erupted.*

“We are rich, I am going to sell this stamp,” her mother danced. Excited, the girl danced too, this was the best news yet...

(TO BE CONTINUED)



Drawing: Dipannita

The interschool Entry

-Avrodweep Das

At last, at Caladenia Primary School, Mark and Dylan were trying out for the extremely tough school cross-country team. Mark had long black, wavy hair that he always had to have tied up at school. He was slightly taller than Dylan was, and much more pleasant.

Dylan was utterly selfish, and incredibly obnoxious. He would always brag about winning competitions at school and would never help classmates with anything. Mark however was well respectful, and extremely optimistic.

Mark was always very respectful to his classmates and teachers. Moreover, even when he lost dreadfully he would always show resilience, and try again.

At their interschool trials, Dylan was self-dependently racing against Mark for the last spot on the school interschool team. It was going to be the best out of three races over 3 lunchtimes. Mark was so excited, for he wanted to get into the tough interschool.

The teacher blew the super loud whistle to start the very first race. Mark had a hard troublesome and complicated obstacle to pass and the unhappy butterflies were flying around furiously in his stomach.

Mark could not stop the butterflies in his stomach to stop flying around. Mark and Dylan left the start; Mark was running fast while Dylan was jogging.

When they were about to leave the school Dylan started running continuously faster, so in the middle of the race on the path Dylan caught up to Mark. Mark was so surprised; he thought that Dylan was slower than he was.

As the race went on, Mark and Dylan were still tied, but somehow Dylan started running super-fast than before. Mark could not believe it, he had lost the race, and now it was 1-0.

Then Dylan started boasting and showing off... The second last race was even harder than they had expected the constructors added many hard





obstacles for them to run around and go through, but Mark was not giving up he ran the fastest he could.

After a while, Mark started getting tired he started running slow, then slower, until he was walking. In his mind, he remembered that he could not lose this time otherwise Dylan will easily win. He ran and ran and ran continually. Although he was tired, he could not give the second race up.

Then, Mark saw Dylan at his feet. Therefore, he had to boost off, and went through the finish line. He could not believe it, he actually won. So now, it was 1-1. Mark was feeling the stitch that was hurting his body.

The next day Mark was running on the oval when his shoe fell off. Without caring, he still ran and ran. Dylan spotted his shoe, and put a very sharp pebble in it.

However, he did not notice one of the teachers standing behind him. "Now I will get into interschool surely" said Dylan in a cackling voice.

At lunch, they ran hard, but this time Mark had to take the very sharp pebble out of his shoe. In addition, start running again so this time Dylan won and the scores were 2-1.

The day when interschool arrived Dylan was in class getting ready for interschool. He was showing-off his shirt, nor did he know the principal was very angry.

When the principal came in and showed that Dylan had cheated. 'OH NOOOOOOOOOO, why did you show it to the class' screamed Dylan.

Mark was so happy, he seized Dylan's clean shirt, and wore it on without caring about him.

Mark came first in the interschool, which made his school win the third time in a row! The teachers were congratulating him while he got on to the podium. He had such a good feeling that he had won.

Moral

Remember you should never cheat in getting in to anything unimaginable!

--O--

The Life Time Opportunity

-Shayan Dash

There he was, Loki the Rabbit, finally contemplating how it felt to have achieved his sole and ultimate dream. This event could drastically alter the whole world. How, do you ask? Well, you'll just have to read on...

As opportunity knocked on Loki's brother's door, he once again failed to grasp it as nature had played him a cruel trick. Rizzo (Loki's brother) was miserably born without discipline. This unfortunate event cost him many things, such friends, spots for national teams, concentration and many more priceless commemorations.

As the winds nearby waved an awfully short hello, Loki's fertile and optimistic mind set to work. He had pondered on the fact that Rizzo was presented with two reachable chances to play the most enhanced and skilful sport of the animal kingdom, Bootkicker, representing TEAM RABBIT.

Loki's whole family were avid fans of this sport, so was nearly the entire community. It was always an honour for luck to gift you with any good values, but it was on another level for TALENT to award you with a pleasant surprise. Make no mistake, Loki had been practising dead hard to envelop a spot in the national squad. Bootkicker is an ultimately thorough PvP (player versus player), as well as an obstacle course. The last player standing was awarded as the winner. Since the Commonwealth Games were a mere two months away, the team was training relentlessly and vigouressly. Just yesterday Rizzo got an offer to train with the national team for Rabbits. The manager of the squad though quietly overlooked it, and withdrew it disheartedly, due to the unruly manner of Rizzo, the future debutant.

Once again, disappointment seeped through Rizzo's mind, and it cost him dearly. Loki, however, could not let failure get the better of him. He trained consistently and wilfully, though sadly achieving no results. Just yesterday, he had a five hour strength and conditioning lesson. It was dutifully harsh. Fatigue had won many wars against innocent rabbits over the past, although





Loki was determined to not let that happen to him.

Just as Loki was returning from a strength bearing lesson, he got a call from his dad. He was more confused than the time he was accidentally was left with an awkward minutes silence with the prime minister of rabbits. (Long story short; he survived by the thread of a needle). It was uncommonly rare and scarce the amount of times his dad ever called. He answered it, and was shocked to hear, "Come here urgently, there is something I want to discuss with you." Now Loki was surprised on a whole new level. This sort of situation never seemed to arise in Lok's household.

As arrived back home, he solemnly found out that his very sacred grandfather had been condemned. For once Loki couldn't help but cry, sadness had taken it's toll.

At school the next day, many students had heard about this news and started teasing him about it. He just felt as if he could disappear into thin air...

He left school more disheartened than ever. That night, he felt searing pains shoot up his legs, and he couldn't sleep at all. This was a bit unlucky as all good athletes need some rest and peace. He must've fidgeted a lot though, because next thing he knew, he was staring at his bedraggled parents.

"Are you ok?" Loki's dad queried. Looking down and up at Loki like he was some sort of bedraggled infrared three headed Martian.

After making a wistful and disdainful look, embroidered with pain, and replied a hasty "no".

Loki's parents eyed him down with suspicion.

As Loki woke up, he bombarded with many questions; "Are you ok now", "Does your leg hurt anymore", "Tell us about everything".

As if that would help to the pain.

Eventually the pain ebbed through his body as if he was the river. It was intolerable and excruciating. Pain had punched him down to the floor as if he were an punching bag. He was taken to the doctors right there, on the spot, literally. He

was confirmed with a deadly disease called Whatchacallit. It happened to many young athletes. This happened from overuse, and deficiency of vitamin B12 (Don't think this is real, I just made it up, because I'm not a doctor). Loki was warned to stay away from any physical activities until the six weeks were over. Just hearing that was absolute torture. After many years of surviving without an injury, luck had ran out of energy.

It was absolute heartburn and torture to witness anyone even running! He felt insipid. This was why he desperately needed a excuse to play some Bootkicker for his local school team.

The next day, the day of the match, he told his coach that his parents had let him play one game. He swore he could feel the length of his nose increase to the size of Pinocchio as he said this.

The coach didn't thoroughly believe him though, but he needed him be cause he was the star player. After pondering on that fact for a while, the coach said that fateful word, yes.

A few hours later, and a catastrophic win, the team were celebrating a catastrophic victory. No-one although was able to notice that Loki, the star player, was clutching his leg wistfully, moaning in pain. Eventually the coach did notice, and had to stop the wild celebrations, much to his teammates bewildered looks. He was escorted down back to his house, where he knew he had to face the music.

Once Loki's parents found out and were nonetheless furious. They banned Loki from playing any Bootkicker for the rest of the season. This was close to depression for Loki. He was determined not to show it. Embarrassment would have teased him about it, according to Rizzo always snickering under his breath. He wanted to harass Rizzo about his failures, and let him suffer, but he couldn't do that, as he was already in a milestone of trouble.

It didn't get better over the next few days, so Loki's parents decided to take it one step further, and cancel school. Loki couldn't help but stifle a roaring laughter that would made Alala (the





laughing god) proud. He had always considered himself a sportsman, not a studier.

He was permitted to play the next week with his teammates against the mighty Gosmore Grammar, the school which many students got to play for a state or even national squad. He played a priceless game that day, as fortune favoured the brave. Gosmore knew about Loki and his starring plays. They had put every best player on Loki, not succeeding though. Loki got a record-breaking six take-downs! His teammates looked on in awe as he single-handedly demolished the cherished group, who were now forlornly trudging back to their bare lockers. He won the Nord Smith's best player on the field.

As he was heading back, a suspicious looking rabbit, in an immaculate three piece suit eyed him up even more suspiciously. He handed him an envelope and just walked away. Loki did his best to resist the urge of just opening it and just reading it. He thought it would be better if he took it home, so the whole family could read it.

As Loki came home, he showed the letter to his parents, who read the letter. It read:

Hi, I'm George Vernon, the most authorised and respect figure of the 'Bootkicker' society. I am otherwise referred to as a widely recognised 'talent scout'. I am pleased to inform you that you have been elected to be the vice-captain of the Gosmore Grammar squad. Please contact me through this number; 0451504557; to confirm your allegiance with our cherished boys.

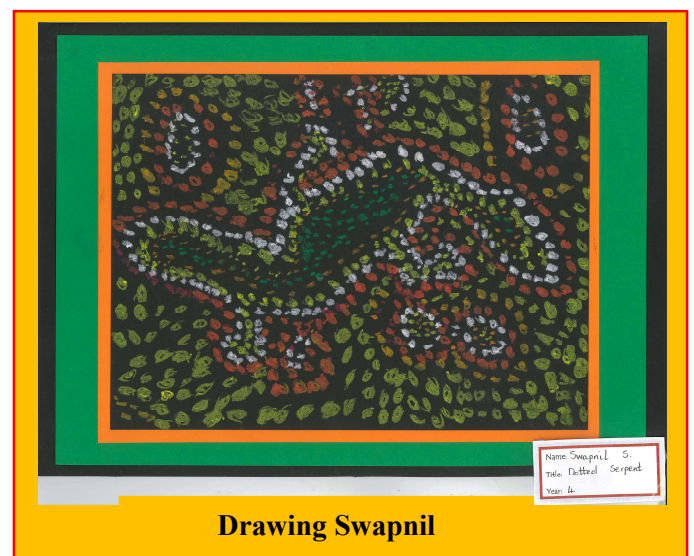
*Many thanks
George Vernon*

As his family read the last word, they screamed up and down with joy. He only person to stay unbothered was in fact the defenceless Rizzo. Good luck had finally shown up to the party. They made the immediate switch and the pressure was on for on of the names that would go down in history.

His first training session was in two weeks, he tried to keep himself in tip-top shape, as well as his best form. Loki had finally ended up making the cut.

10 years later, he was standing there, on the legendary Gabba, the most prized and priceless stadium to all rabbits. Team Rabbits had found it's way down to it's very first grand final against the mighty and delirious Beavers. It was Loki versus Batty (one of the beavers). It was his first battle in a grand final, probably his last. Loki made up from the beavers heftiness with his incredible speed and agility. It ended up being the most gruelling and time-dominating match. It ended up being a whopping thirty-two hours. A few attacks later, he was holding the trophy, while his nation's anthem blared around them. This drastic event was caught live on TV, which inspired many other bored Rabbits to do the same. That truly did change the history of the whole world.

--O--





Pranks -Rayan Dash

12 yr old Mike gestured his hand to his friend, Ret, to sit next to him. Ret did not see or know the hilarious joke that was awaiting him as he sat on the bus's cushioned seat. Pffffffffftttttt! Went the whoopee cushion Mike had secretly placed on the spot his friend was sitting on.

"Haaaaahaaaaaaahaaaaaaa!" went the kids on the bus laughing at Ret, as they had thought that he'd done the most obnoxious fart... EVER! Ret just glanced over at his friend with a displeased face.

"Aaaaaaaaah!" went an innocent student screaming as a fake frog croaked next to him. He was so scared that the unlucky people next to him had to suffer the unpleasant noise of continuously loud screaming being produced by the student.

"Haha", chuckled Mike under his breath. The series of hilarious jokes he had played on the unlucky victims he chose to pick on made him laugh, as he looked at them suffer.

Everyone knew that Mike had played the tricks as he was the school clown.

Vroooooom! That was the bus's engine roaring to life as it rumbled its way to Bush Lake, their camping spot for the next few days.

For Mike this was going to be an interesting camp as he had myriads of tricks to play on people he had never picked on.

As the bus lurched to a halt, the school children hopped off.

The first task for the children was to make their tent, after they'd chosen a group of four. Mike didn't help his group, as he was looking to play a prank in one of the tents.

"Oh look at this", muttered Mike to the group. There was actually nothing there inside the tent, he just muttered it so he could play his tremendously funny trick. He laid down his fake scary - looking spider he had packed for the journey. Mike placed it, in the tent, as he ran

toward the bushy area where the biggest bushes were.

"Aaaaaahhhhhhh!" screamed the group as they entered their tent. However, the scream was so short because the kids ran towards the teacher and their voices faded away.

"Hmmmmmm" the teachers muttered, as they investigated what was happening.

"That was close!" Exclaimed Ret, "You nearly got caught!" he made an expressed face that made Mike feel happy, since it looked like Ret liked the hideous prank.

"How'd you know I almost got caught?" Questioned Mike, his red hair fluttered uncontrollably in the wind as he spoke.

"I saw you sneak off when we were just about started with our amazing tent", Ret replied. He made his hand do a circle to clarify how amazing it was.

"Oh", answered Mike as he dashed towards the toilets as he fake busted. He just wanted to play another wholesome trick that he had up his sleeve.

He didn't see a teacher standing next to the toilet, as he was focusing on getting to the toilet.

"He he", snickered Mike, who ever was going to enter the toilet was surely going to suffer a terrible time.

The trick was to put down a remote controlled mouse in the bush toilet, and control it to jump out of the bush toilet at the last second.

What Mike didn't know was that a teacher was going to enter next.

"Aiiieeeeeee!" Screamed the teacher, as ran outside to find out who had done it.

"Sorry, sir". Mike sputtered. Mike thought that was the end of his tricks, but it wasn't.

There was one trick he desperately wanted to play. It was to put a gorilla costume on, and then jump out of a tree and scare everyone, would be the most hideous trick of all time... Mike thought.





In the following day, Mike was ready to play his tremendously funny trick.

Jump! Went Mike in his gorilla costume jumping out of a tree, while the children were hiking. "Aaahhhhhh!" squealed the kids that were hiking. They dashed up the hill, faster then they were going before.

As the sun came up next morning, kids on the adventures hike were packing up to go back to school. Some kids were tremendously glad and some were miserable. They where that feeling as some wanted to go back to school and some didn't.

Mike had been pondering about where the the fun was going to come from now. Now a hilarious trick was just about to be played on him, and he didn't know that. Ret, was going to play it. "Sccccccrrrrrrreeeeeeaaaaammmm!" Mike shrieked, a pin had been placed on the comfy bus seat. It was there to make him regret playing all of those hilarious pranks. "What is wrong with you, Mike?" the teacher asked him with a scrunched up face. As the teacher's words had been spoken, the students went into hysterics.

Mike, however, didn't enjoy being pranked on. Now he understood his mistake of pranking everyone, and therefore he apologised.

--O--



Drawing- Etha

Rainy Blues -Prithul Bisshay

Pitter patter pitter patter.

The rain poured down on the convenience store.

"Hey."

"Hm?"

The person in the rain makes a confused noise as the other holdstheir umbrella over both.

"Thanks, I guess."

"A bit more of a thank you would be nice, you know? It's raining cats and dogs out here and I'm saving you from the cold."

"Well thank you, Mahatma Gandhi, for your kind benevolence."

"Aw, you're making me blush."

The two figures stood in silence as the rain pounded down on the umbrella.

"Quick question."

"Yeah?"

"Who are you?"

These people were also strangers.

"Does it matter? Just think of me as a kind Samaritan, graciously caring for you in the rain."

"What if you're some psycho?"

"Do I look like one?"

"...What do psycho's even look like?"

"My point exactly."

Silence fell between them again.

"What are you even doing out here? Standing in the rain, I mean."

"Hm... just felt like it I guess."

"Are you an idiot or something?"

"Probably. Why are you helping me?"

"I already said I'm a good Samaritan."

"That doesn't... Whatever."

The one standing giggled.

"What are you, a kid?"

"Does that matter?"

"I've known you for 5 minutes and you already get on my nerves."

"I'm glad."

The one holding the umbrella was an office lady. Pixie cut, dress suit and tie, blazer, much taller than you would think and looked to be in her twenties. Her umbrella was blue and had a popular character on it, and she had an ear piercing on her left ear. She had blue eyes and black hair.





The one on sitting lazily on the ground was a highschooler. He was not in uniform, instead in black jacket, cap, mask and trackpants and earphones. He was wearing a black tracksuit with a red embellishment of a cross on the front that looked spray painted on under the jacket. He was wearing fingerless gloves and red sneakers; they were not name brands though. He had an ornamental earring of a crown and a piece of string tied to his neck with a metal ring strung on it. His eyes were a mix of hazel and green, his short, wet hair was blonde.

“Did you go through a breakup or something? Was it cause you’re a delinquent or something?”

“Me? A delinquent? And no, I did not go through a breakup. I just like the rain.”

“Well, you seem like one to me. Also, you might ‘wanna change clothes, those are completely soaked.”

“I am aware, but do you see me with clothes? Or money?”

“What person goes to a convenience store without money?”

“Me, obviously. If you want me to change then be a *good Samaritan* and give me some money.”

“Hell no.”

“Thought so. Is that a G*rr*n L*g*n character?”

“Wow, you noticed?”

“Well sorry I like mecha. D’ya wanna listen to my music?”

“Wait, you have earphones in?”

“Only one now, I took the other out as you started talking.”

“What are you listening to?”

“I have no clue anymore. I have two hundred songs and I put my playlist is on shuffle. This playlist is, like, 3 years old. This is a lucky draw at best.”

“Sounds fun. Gimme.”

The highschooler gives the other earbud to the lady, who was now sitting down.

“Is this Russian Roulette?”

“That’s the name?”

“Hey, this song is pretty popular with the kids, you know?”

“You sound like you’re in your thirties and grasping at straws to seem younger than you actually are.”

“...I’m actually 26 you know.”

“And I’m 16. I’m probably taller than you.”

“Well, jeez, no need to rub it in.”

“I’m going to.”

“Meanie. Maybe this is why you were dumped.”

“I already told you that isn’t what happened.”

“Wow, it was that bad?”

“I’m not even dating anyone.”

“Makes sense with your personality.”

“Rude.”

“Heh.”

The conversation was short at best. 5 minutes, 6 even. Even after it ended, they simply sat together, listening to music. Two wanderers, simply sharing a moment in the pouring rain.

And the rain wouldn’t let up anytime soon.

--O--

ভাবনা আমার শিমুল ডালে

-স্বর্ণা আফসার

ভাবনা এক

লিডারশিপ এর সংজ্ঞা কি? নেতৃত্ব বা লিডারশিপ এর সংজ্ঞা একেই মানুষের কাছে একেই রকম। কেউ কেউ ভাবেন নেতা তিনিই যিনি সকলের উপরে খবরদারি করতে পারেন। চোখ বন্ধ করে তারা দেখতে পান এমন কোনো নেতাকে যিনি ভরা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন। তার মাথায় কেউ পেছন থেকে ছাতা ধরে আছে। নেতার ভাষণ শুনে জনতা আন্দোলিত হচ্ছে, মানুষের সমুদ্রে লাগছে উৎসাহের জোয়ার, অনুপ্রেরণার জোয়ার। নেতার পেছনে আছেন ডজন খানেক চালা। তাদের মধ্যে কেউ ভাষণ লিখে দিয়েছেন। কেউ নেতাকে সময় দিয়ে মুখস্থ করিয়েছেন। কেউ কেউ ঘুরছেন নেতার সার্বিক সুখ সুবিধা দেখবার জন্য। বিনিময়ে তারা নিজেদের সুবিধা অসুবিধা আদায় করছেন। এই নেতার মধ্যে কিছুই যে গুণাবলী নেই তা নয়। নেতার সব থেকে বড় গুণ তার কথা শুনে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়। এই অনুপ্রেরণার পেছনে কি আছে? মানুষ কেন অনুপ্রাণিত হচ্ছে?

আবার একটা ভিন্ন চিত্র দেখি। সাত শতাধিক শিশু একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। স্কুলটির সর্বোচ্চ মর্যাদার পদ প্রধান শিক্ষিকার। অথচ তাকে আমরা সকালে স্কুলের গেট খোলা থেকে শুরু করে দুপুরে ছুটির সময়ে গেট বন্ধ করা এমন যাবতীয় কাজে অগ্রণী ভূমিকায় দেখি। স্কুল ছুটির সময়ে রাস্তা পারাপারের জন্য থাকেন একজন ওয়ার্ডেন। কখনো ওয়ার্ডেন অসুস্থ হলে প্রধান শিক্ষিকা নিজেই হাসি মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছোট ছোট শিশু ও তাদের পিতামাতাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেন। তিনি ভাবেন তার শিক্ষিক ও শিক্ষিকারা সকলে সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত। তিনি নিজে একটু বেশি কাজ করলে সকলে সুন্দর করে রাস্তা পার হতে পারবে। বিপদ মুক্ত থাকবে তিন থেকে বারো বছরের শিশুরা। তাকে আমি দেখেছি সাতশো বিদ্যার্থীর অনেককে নাম ধরে ডাকতে। তাদের কাজে উৎসাহ দিতে। ফেয়ারওয়েল এর দিনে কাঁদতে, আর হাসির কথায় প্রাণ খুলে হাসতে। এই হচ্ছে আরেক ধরনের নেতা। মানুষ গড়ার কারিগরদের নেতা। তিনি সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করেন তার দলের সবাই যাতে তাদের কাজটা সহজ করে করতে পারেন। তার





কথা শুনেও সবাই উৎসাহিত হচ্ছে, অনুপ্রাণিত হচ্ছে। তার অগণিত মোসাহেব নেই, কিন্তু অনেক গুণগ্রাহী আছে।

নেতৃত্ব মানে কোথাও জোর করে কর্তৃত্ব ফোলানো নয়। নেতৃত্ব মানে দায়িত্ব পালন করা, নেতৃত্ব মানে নিজের কর্তব্য করা। সফল নেতা তাকেই বলা যেতে পারে, যার সহচর্যে এসে তার দলের সকলে নিজেদের পূর্ণ ভাবে বিকশিত করতে পারে। তিনি দলের সকল সদস্যের গুণাবলীর সাথে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি তাদেরকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রতিদিন মেশিন অটোমেটেড করে দিচ্ছে সহজ কাজগুলোকে আর শ্রম প্রধান কাজগুলোকে। এখন কাজে প্রয়োগ করতে হয় চিন্তা শক্তি, মেধা অথবা সৃজনশীলতা। একটি ছোট গন্ডির মধ্যে থেকে কাজ করা এখন বিরল। অনেক প্রতিষ্ঠান এখন মাল্টিন্যাশনাল। যার দরুন রিমোট ওয়ার্কিং এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এই দলগুলোর নেতৃত্ব দেয়া বেশ কঠিন। মানুষের সাথে দূর থেকে কম্পিউটার মাধ্যমে গড়ে নিতে হয় বিশ্বাস আর আস্থা। এর জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলীর। সবাইকে একসাথে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে নেতাকে কখনো বন্ধু হয়ে গল্প বলতে ও শুনতে হয়, কখনো পিতা বা শিক্ষকের মতো উপদেশ দিতে হয়, কখনো বিপদে সাথী হতে হয়।

এবারে একটু নারী নেতৃত্বের কথায় আসি। ২০২০-২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়াতে ১৯.৪% সিইও নারী, ১৮% বোর্ড এর চেয়ারপারসন নারী। এই বৈষম্য উন্নত বিশ্বকে সত্যি ভাবাচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এমনকি ইউনিভার্সিটি শিক্ষার হার নারীদের বেশি থাকলেও চাকরির ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে আছেন বেতন এবং নেতৃত্বে। এদেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো চেষ্টা করছে নারীদের জন্য সমতা নিয়ে আসতে। নারীদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় সমাজ ব্যবস্থা। সংসারের কাজ নারী ও পুরুষের মধ্যে সুষম ভাবে বন্টিত নয়। সন্তান লালল পালনের ক্ষেত্রেও নারীকে বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। এতো কিছু করার পরেও নারীরা প্রায়ই কটুক্তির শিকার হন। নারীর অর্জনকে ছোট করে দেখা হয়। নারীর নিজেদের প্রতি পদে প্রমাণ করতে হয় ঘরে ও বাইরে। অথচ যেই সব ক্ষেত্রে নারীরা নেতৃত্বে অগ্রগামী রয়েছেন, সেই কোম্পানিগুলোর মূল্য শেয়ার বাজারে বেড়েছে বই কমেনি।

নতুন দিনের জন্য আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে মানুষের সাথে কাজ করতে পারা, মিলে মিশে সবার জন্য কাম্য একটি পরিবেশ তৈরী করা ভবিষ্যৎ নেতাদের কাছ থেকে সময় দাবি করবে। তাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে টীম ওয়ার্ক শিখতে হবে, শিখতে হবে কেমন করে যেকোনো প্রতিকূলতার মুখেও ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিতে পারা যায়। আজ ভারত বংশোদ্ভূত অনেকেই বিশ্বের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ আসনে আসীন। এমন দিনের স্বপ্ন দেখি, যেদিন লাল সবুজের বিজয় নিশান উড়িয়ে আমাদের আগামী প্রজন্ম জয়গা করে নেবে বিশ্ব মানচিত্রে।

ভাবনা দুই

“আয় বৃষ্টি ছেপে

ধান দেব মেপে”

এই ছড়ার মতো জীবনে ধূসর মেঘের বৃষ্টি কেউ যেচে পরে ডেকে আনতে চায় না। অবশ্য অসময়ের বর্ষণ সবসময় বলে কয়ে

আসেনা। “সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হয় হয় কেউ কারো নয়।” এই কথাটি চরম সত্য। তবু সময় থাকতে অসময়ের কথা কেউ আমরা চিন্তা করিনা। কোন অসময়ের কথা বলছি? বলছি সকল অনর্থের মূল, আর্থিক অনটন জনিত দুঃসময়ের কথা।

সতেরো বছরের ওপরে ব্যাংকিংয়ের সাথে জড়িত থেকে আমার উপলব্ধি, স্কুল কলেজ গুলোতে বাধ্যতামূলক ভাবে উচিত অর্থ বিষয়ক শিক্ষা দেয়া। শৈশব থেকে যদি লাভ, ক্ষতি, আয় ব্যয়ের খটোমটো অথচ বাস্তবমুখী শিক্ষাগুলো যদি ছেলে মেয়েরা অর্জন করে, তাহলে জীবনের খেলার মাঠের অঙ্কগুলো হয়তো তাদের জন্য সহজ হবে। এই দেশে অনেক বাবা মা ছেলে মেয়েদের পকেট মানি দিয়ে থাকেন। এতে করে সন্তানদের সঞ্চয় করা ও খরচ করা এই দুধরণের হিসাব শেখা হয়।

অনেক পরিবারে সঞ্চয়ের স্বভাব একেবারেই থাকেনা। দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতির সময়ে এই পরিবারগুলো ঘোর সঙ্কটে পরে যায়। লোক লজ্জা বা অভ্যস্যের দরুণ পরিবারগুলো খরচ কমাতে পারেনা। ব্যাংকের কাছ থেকে ধার ও কর্জ করতে করতে এক সময়ে ক্রেডিট রেটিংস খারাপ হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে ব্যাঙ্ক ধার দিতে চায়না। বাধ্য হয়ে এদের তখন চড়া সুদের ঋণ নিতে হয়। অথবা ক্রেডিট কার্ডে চড়া সুদ দিয়ে চালাতে হয় সংসার খরচ।

২০১৯ সালের জরিপ অনুযায়ী দেখা গেছে ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৪.৭ মিলিয়ন payday লোন নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ানরা। এদের মধ্যে ১৯ শতাংশ নারী, যাদের ৪১ শতাংশ সিঙ্গেল প্যারেন্ট। নিরুপায় হয়ে মানুষ যখন শরণাপন্ন হয় তখন payday লোন নিতে বাধ্য হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের কাছ থেকে ১১২ শতাংশ থেকে ৪০৭ শতাংশ সুদ আদায় করে।^১ এই চড়া সুদের ঋণ শোধ করতে গিয়ে মানুষ আবারো ঋণ নেয় এবং ক্রমাগত তলিয়ে যেতে থাকে ঋণের অবিচ্ছেদ্য চক্রের চক্রান্তে। অনলাইনে সহজ সুযোগ পাওয়াতে অনেকে এই ঋণ নেয়া শুরু করেন। যেকোনো সচ্ছল পরিবারও এই পরিস্থিতিতে পড়তে পারে ভাগ্য চক্রে। কাজ থেকে অব্যাহতি, অসুস্থতা, এমন যেকোনো আকস্মিক ঘটনা থেকে শুরু হতে পারে আর্থিক অনটন।

কেউ যদি এমন অবস্থায় পড়ে থাকেন, তাহলে তাদের অবিলম্বে নিজেদের ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ব্যাঙ্ক financial hardship এর ব্যবস্থা করতে পারে।

অর্থনৈতিক দুর্যোগ এড়ানোর জন্য যেকোনো পরিবারের তিন মাসের আয়ের সমপরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে রাখা উচিত। এতে করে হাতে কিছুটা সময় পাওয়া যায় দুর্যোগের মুহূর্ত কিছুটা স্বস্তিতে পার করার। ক্রেডিট কার্ড অকারণে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা ভালো। কার্ড কোম্পানিগুলো অনেক সময় লোভনীয় অফার দেয় পয়েন্ট অর্জন করার। যদি কার্ড এর খরচ প্রতি মাসে মিটিয়ে না দেয়া যায়, তাহলে খরচ কার্ডে না করাই উত্তম।

¹https://consumeraction.org.au/wp-content/uploads/2019/11/Payday-Lending-Report_FINAL_UPDATED_WEB-1.pdf





সম্ভব হলে বড় আকারের ঋণগুলোর জন্য প্রতি সপ্তাহে পরিশোধ করা ভালো, এতে ঋণ কিছু আগে পরিশোধ হয়, সুদ কম দিতে হয়।

জীবনের লক্ষ্যের মতো আর্থিক কিছু লক্ষ্য থাকা জরুরি। ফিন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, যেখানে ধার দেনা সব পরিশোধ হয়ে যাবে, এমন স্বপ্ন আমরা দেখতেই পারি। তবে বাস্তবায়নের জন্য ধীরে ধীরে এগুতে হবে। ঋণ পরিশোধ করাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

তবে এটাও সত্য মানুষ মাত্রেরই আনন্দ পিয়াসী। তাই আর্থিক পরিকল্পনার সময়ে নিজের পছন্দের খাতে কিছুটা ব্যয় করা উচিত। এতে করে মানসিক চাপ এড়ানো যায়।

পরিশেষে বলছি, মুখে অর্থকে অনেকেই অনর্থ বলে থাকলেও, এই সময়ে অর্থ আমাদের জীবিকার উপায়। আয়-ব্যয় ও সঞ্চয় এই তিন খাত পরীক্ষায় যতই নাকানি চুবানি খাওয়াক না কেন, জীবনের পরীক্ষায় সকলের সহায় হোক, এই কামনা করছি।

--O--

আত্মোপলব্ধি

-শরিফা টুলটুলী

“তখনই আমরা একটা জিনিস স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যখন আমরা সেই বিষয় বা জিনিসটাকে ধীরে দেখি, গভীরভাবে দেখি বা মনোযোগ সহকারে দেখি।”

যেমন ধরা যাক এক শান্ত পুকুর, যেখানে বসে একজন মানুষ আনমনে পাথরের ছোটো টুকরা পানিতে ছুঁড়ে ফেলছেন। যদি তিনি অন্য কিছু ভাবতে থাকেন, তবে পানিতে পাথরের টুপ করে পড়ার শব্দ এবং পানিতে দৃশ্যমান ছোটো থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকা তরঙ্গক্রিয়া তিনি অনুভব অথবা উপলব্ধি করতে পারবেন না, কেননা তার মনোযোগ অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে।

আবার ধরা যাক, আমাদের প্রতিদিন কার চলার পথে ফুটে থাকা বাহারি বন ফুলের কথা। আনমনে থাকা অথবা ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ জীবনে তাড়াছড়ো পদচারণায় অনেক সময় আমরা এই বাহারি সুন্দরকে নিজেদের পা দিয়ে মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলি। কিন্তু আমরা যদি একটু ধীরে হাঁটি আর ধীরে দেখি, তবে ওই সুন্দর বনফুলগুলোকে মাড়িয়ে যাওয়ার সাহস আমাদের হবেনা। আমাদের মনে তখন আলতো করে বনফুলগুলো ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছা যথবে। আমরা। আলতো করে ফুলগুলো ছুঁয়ে দেখবো।

তাড়াছড়ো করে না হেঁটে গিয়ে, আস্তে করে হেঁটে বনফুলকে স্পর্শ করায় ওই মুহূর্তে ধরণীর দুইটি উপকার হলো। এক, প্রকৃতির ছোট্ট এক সৌন্দর্যটিকে থাকলো আর দুই, যে মানুষটি সৌন্দর্য টিকিয়ে রাখার কাজটি করলেন তার মনে প্রশান্তি এলো। এই দুটি বিষয়ই সুন্দর।

সেদিন Naval Ravikant এর একটা উক্তি পড়লাম, সেখানে তিনি বলেছেন, “Play long term game with long term people.”

জীবনে সব কিছুকে যত্ন করে দেখা বা বিনয়ের সাথে আনন্দ নিয়ে দেখার মধ্যে প্রাপ্তি আর সুখ থাকে। জীবনে কিছুকিছু ক্ষেত্রে

পরিবর্তন দরকার হয়ত বে কয়েকটি জিনিসের স্থায়িত্ব খুব দরকার। মানুষের সাথে সম্পর্কের স্থায়িত্ব। জীবন সাথীর সাথে সম্পর্কের স্থায়িত্ব, পরিবারের সাথে সম্পর্কের স্থায়িত্ব, বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব। আমার কাছে মনে হয় মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ভাঙ্গা গড়ার বিষয় মানুষকে শেখায় অনেক, কিন্তু এই ভেঙে যাওয়ার বিষয়টা কষ্টের, অদৃশ্য রক্তক্ষরণের।

অথবা কষ্টের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব শুধু যদি তাড়াছড়ো বা অস্থিরতা না করে ধীরে বা ভেবেচিন্তে বন্ধুত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। গভীর পর্যবেক্ষণে যেন বোঝা যায় ওই পথ বিপদজনক, যেন ধীর পায়ে পিছু হটা যায়।

এই প্রবাস বা অভিবাস জীবনে আমরা রক্তের সম্পর্কগুলো ছেড়ে এসে আত্মার সম্পর্ক জড়িয়ে বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু অবজারভেশনের অভাবে মাঝে মাঝে আমাদের বিপদে পড়তে হয়, যে বিপদ মনে ব্যাধি ঘটায়।

ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়টা নিয়ে আমি সত্যিই সুখী। গত নয় বছরের অভিবাসন জীবনে আমার বন্ধুচক্র বা সার্কেল দুটি। এতো দীর্ঘ বন্ধুত্ব টিকে থাকার একটি কারণ মনের বা নীতির মিল। আদর, ভালোবাসা যত্ন দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব দিনদিন আরো বড় হচ্ছে মজবুত হচ্ছে। এরা ছাড়াও আরো দু'একজন বন্ধু আমার রয়েছেন যাদের সাথে আমার সম্পর্ক মধুর এবং অবশ্যই মজবুত। আমাদের এই সম্পর্ক দীর্ঘ ও স্থায়ী হওয়ার কারণ হচ্ছে যত্ন, শ্রদ্ধা ও মনোভাবের মিল।

তবে দুইটা যে ভীষণ ভীষণ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তা অন্য জায়গায় অন্য কোনখানে মানে আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের বাইরে তারা। জীবনে ভালোর অভিজ্ঞতা অনেক থাকে কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের মনে দাগ কাটে বেশী, বাজে ভাবে শিক্ষা দেয়। যেমন আমরা সারা বছর সুস্থ থাকি, কিন্তু আমরা এই সুস্থতাকে মনে করি স্বাভাবিক আর যে কয়েকদিনে মাথাব্যথা, জ্বর, ঠাণ্ডাকাশি, ডায়রিয়া থাকে ওই দিনগুলো আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে আর ওই খারাপ জিনিস বা বিষয়গুলো আমরা মনে রাখি বেশী, ভুলে যাই ভালো থাকার দিনের কথা কিন্তু জীবনে ভালোর পরিমাণ অবশ্যই বেশি, জীবনে অসুন্দরের চাইতে সুন্দরের পরিমাণ আলবৎ বেশী।

জীবন আসলে খুব ছোটো নয়। যদি একজন মানুষ ষাট অথবা সত্তর বছর ও বাঁচেন সেই হিসাব করতে গেলেও জীবন অনেক বড়। সেকেন্ড, মিনিট আর ঘণ্টার হিসাব করতে গেলে মুহূর্তগুলো অযুত লক্ষ নিযুতের ঘর ছাড়িয়েও বহুদূর যায়।

আমরা আসলে সব্বাই ভালো থাকতে চাই, সুখী থাকতে চাই। আমার মনে হয় ভালো রেজাল্ট করতে হলে যেমন পড়াশুনা করতে হয়, চাকরীতে ভালো করতে হলে যেমন দক্ষতা বাড়াতে হয়, সুখী থাকতে হলে ও সাধনা করতে হয় অথবা সুখী থাকার দক্ষতা বাড়াতে হয়।

মন, আত্মা বা কলফ যাই বলি না কেন যদি শুদ্ধ থাকে তবে সব সুন্দর। যার কয়েকটা চর্চা আমরা ইচ্ছা করলে করতে পারি। যেমন-

১. অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।
২. অন্যের উপকার করা এবং প্রতিদান আশা না করা।





৩. বন্ধুকে আরো বন্ধু বানানোর চেষ্টা করা, গুরুত্ব দেওয়া ও বন্ধুত্ব সম্পর্কের যত্ন নেওয়া ও সম্মান করা।

৪. শত্রুর সাথে যুদ্ধ না করে এড়িয়ে চলা বা ইগনোর করা

৫. অধিকার নাই এমন জায়গায় তর্কে বিবাদে না যাওয়া।

৬. কেউ পছন্দ করছেন বা বাঁধা গেলে দূরে সরে যাওয়া। এক্ষেত্রে এই যুগে অনলাইন, অফলাইন সব লাইন থেকে যে আপনাকে পছন্দ করছেন, নিজেই নিজেকে তার কাছ থেকে অনফলো করে ফেলুন।

৭. নিরবে, নিভৃতে ধ্যান করা অথবা মেডিটেশন করা, এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা।

৮. নিজের ভুলগুলো খুঁজে বের করা ও তার সমাধানের চেষ্টা করা।

৯. টক্সিক পিপল নেতিবাচক আচরণের অধিকারী মানব সম্প্রদায় থেকে দূরে থাকা, তাদের কথাবার্তাকে তেমন পাত্তা না দেওয়া অথবা তাদের কথায় কোন প্রকার কষ্ট না পাওয়া।

১০. বিবাদে যাওয়া যাবেনা। বিশেষ করে কেউ যদি কোথাও থেকে তিল শুনে এসে সেই তিলকে তাল অথবা কাঁঠাল বানিয়ে বিবাদ করতে আসে, তাদের ইগনোর কইরা ঘাপটি মাইরা পইড়া থাকপেন নচেৎ বাইরা দৌড় মারেন। কারন দুনিয়া উল্টায় গেলেও আপনি এগোর সাথে পারবেন না।

১১. জিহ্বা নিঃসৃত ধ্বনি, বাক্য বা শব্দ দ্বারা কারো মনে কষ্ট না দেওয়া। আর কষ্ট দিয়ে ফেললে ও সরি বলা বা মারফ চেয়ে নেওয়া, এতে মন আরাম পায়।

১২. অযথা টাকা পয়সা অপব্যয় না করা এবং মানবের কল্যাণে টাকা ব্যয় করা।

১৩. হাসির ও আনন্দের উপাদান খুঁজে খুঁজে উপভোগ করা। হাসতে হবে ও হাসাতে হবে। এই ক্ষেত্রে হাসির বই পড়া ও হাসির মুভি দেখা যেতে পারে।

১৪. পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। পরিবারের ব্যাপারে মনেপ্রাণে ও কাজেকর্মে খুব সিরিয়াস থাকতে হবে। মাঝে মাঝে ভালোবাসা আর দায়িত্ব বোধ বাড়ানোর জন্য পরিবারের প্রায় সবার সাথে মান অভিমান করতে হবে। ফোন না দিলে, ফোন দিয়ে "তুমরা আমারে ভুইল্যা গেছো।" এই কথা বলে ভ্যাভ্যা করে কাঁদতে হবে। নাকের পানি চক্ষের পানি ওড়নার আঁচল দিয়ে মুছতে হবে। অবশ্যই স্বামী, সন্তান, বাবা, মা, দাদী, ভাই, বোন, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, ভাইবো, জা, বোন জামাই, ফুপু, মামা, খালা, কাজিন এদের সবার সাথে চিল্লাচিল্লি, ভ্যানোর ভ্যানোর, প্যানর প্যানর করা যাবে কারণ এখানে আমার অধিকারেরা থাকে কেননা এরা আমার আগলে রাখে, আমি এদের আগলে থাকি।

মানব জীবনের ভালো খারাপ এই বিষয় দুটি আমার কাছে এক প্রকার ইকো সিস্টেম মনে হয়। মানে ভালো কাজের বা ভালো থাকার ইচ্ছা পোষণ করলে শুধু পর্যায় ক্রমে ভালোই হয় আর খারাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করলে মন প্রাণ শুধু খারাপ চক্রেই আবদ্ধ থাকে।

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ধরনীতে ভালোর চক্রে এবং সুন্দরের গুণিতে ঘূর্ণমান মানবের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী, যে কারণে এতো ধরনী অপরূপ, জীবন এতোটা সুন্দর।

--O--

ভালোবাসার এক অনন্য নিদর্শন

-সাইফুল ইসলাম

সকাল থেকে বড়দিনের উৎসবের আমেজ অনুভব করা শুরু করলাম। আজ আমার অফিসের খ্রিস্টমাস পার্টি হবে সন্ধ্যায়। এরপর আমাদের প্রায় দুই সপ্তাহ ছুটি। সবাই আজ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আছে। আমি আমার প্রজেক্টের কিছু অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে বসলাম, আমার টিমের জুনিয়র প্রোগ্রামার বলে: দেখো, সবাই আজ অফিস এ ফেস্টিভ মুড এ আছে, দুপুর একটায় সিক্রেট সান্তা নিয়া এক্সসাইটেড। আমি ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করলাম এবং বুঝলাম। গত ২/৩ সপ্তাহ আগে আমাকে একটা কার্ড লটারী করে দেওয়া হয়েছিল তাতে এক কলিগের নাম লিখা, বলা হয়েছিল তার জন্য একটা গিফট কিনে আজকে নিয়ে আসতে, যা বিশ ডলারের কম হতে হবে। যা হবার তাই হলো, আমি ভুলো মনা মানুষ, আজকে সকালে আমার মনে পড়ছে, তড়িঘড়ি করে বাসার একটা গিফট হ্যাম্পার গিফট কাগজে মুড়িয়ে, লটারীতে উঠা কলিগের নাম লিখে নিয়ে সিক্রেট সান্তা রুমে রাখলাম।

সবাইকে ডাকা হলো দুপুর একটায়। একে একে সবার নাম ডাকা হলো আর গিফট বাক্স গ্রহণ করে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সবার শেষে ঘটল এক কান্ড, যা আমাকে বিস্মিত এবং আন্দোলিত করলো। ভদ্র মহিলা নাম ডাকলো "এসটোর", দেখলাম আমাদের অফিসের এক ডিরেক্টরের কুকুর সামনে এগিয়ে গেল, গিফট দেওয়া হলো এবং সে কামড় দিয়া গিফটটা নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। "এসটোর" আমাদের অফিস এ মাঝেসাঝে আসে, খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন কুকুর।

প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের এশিয়ান দেশগুলোতে খুবই বিরল। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এর ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তখন খুব সম্ভবত ক্লাস ফাইভে পড়ি, আমাদের স্কুলের পাশের বাড়িতে রাতে এক চোর ধরা পড়েছে। শীতের কুয়াশাটকা সকালে কৌতূহলবশত আমিও চোর দেখতে গিয়েছিলাম, মহাআনন্দে সবাই চোরের প্রতি হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, লোকটির দেহ ভেজা ঘাসের উপর পড়ে আছে, নখগুলো প্রায় উঠিয়ে ফেলেছে, মুখ থেকে রক্ত ঝরে তা শুকিয়ে গেছে, মাছি ভন ভন করে মুখের ভিতরে যাওয়া আসা করছে। কেও কেও আক্ষেপ করে বলাবলি করছিলো, "এখনো দম যায়নাই, চোরের জাত আরো সময় লাগবে মরতে"।

আমার প্রশ্ন: কোনো না কোনো কারণে সে চোর বলে উপাধী পেয়েছে, জন্ম থেকে তো সে চোর ছিলোনা? খুব জানতে ইচ্ছে করে, কতনা যত্ন করে তার মা বাবা এই ছেলেটিকে ভ্রূণ থেকে এই পর্যন্ত আগলে রেখেছে, হয়তোবা নিজে না খেয়ে ছেলেকে খাইয়েছে ... এইদেশের "এসটোর"রা ভালোবাসার মধ্যে ডুবে থাকে, তাদের জন্য আলাদা ডাক্তার, আলাদা হাসপাতাল এবং মানুষের মতো সমান অধিকার। আমাদের দেশে কবে অন্তত মানুষের প্রতি যথার্থ সম্মান ও ভালোবাসার জন্ম হবে? হয়তো নতুন প্রজন্ম একদিন এই শৃঙ্খল ভাঙবে এবং বুঝতে শিখবে এবং পাল্টেদেবে সমাজকে।

সবাই সিক্রেট গিফট খোলা শুরু করলো, আমি আবাবো বিস্মিত হলাম। সবাই সবার জন্য গিফট কিনেছে অনেক সময় নিয়ে এবং





অনেক চিন্তা ভাবনা করে। কে কি পছন্দ করে, কার কি লাগবে। যেখানে টাকা পয়সার বাহাদুরীর কোনো অবকাশ নেই।

টম সদ্য বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ হয়েছে, তাদের নতুন সংসারে একটি ছোট্ট বিড়াল তাদের অলস সময়ের সঙ্গী, তাই মাইকেল, টমের বিড়ালের জন্য একটি সুন্দর জামা, খেলার বুনবুনি এবং ছোট্ট একটা তুলেতুলে কম্বল নিয়ে এসেছে। টম এই গিফট দেখে আনন্দে চোখ মুছতে লাগলো। জাস্টিনের জন্য কারলি কিনেছে একটা কফি কাপ যাহাতে সাইকেলের একটি ক্যালিগ্রাফি, জাস্টিন সাইকেল চালিয়ে অফিসে আসা যাওয়া করে, সাইকেল তার এত প্রিয় যে, পাঁচশ ডলার থেকে শুরু করে পনের হাজার ডলার পর্যন্ত চৌদ্দটি সাইকেল তার সংগ্রহশালায় আছে। এই গিফট কেনার জন্য কারলি ২০ টির বেশি দোকান ঘুরেছে। জাস্টিন এই ইউনিক গিফট দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে কফি বানিয়ে খাওয়ায় কারলিকে।

আমাদের মধ্যে লোক দেখানোর প্রতিযোগিতায় আমরা ব্যস্ত এখন। সত্যিকারের ভালোবাসা হারিয়ে যাচ্ছে সময়ের অসীম ব্যবধান। শুধু টাকা পয়সার মাপকাঠি দিয়ে আমরা মাপতে ব্যস্ত আমাদের গাণিতিক সম্পর্ক গুলোকে যাহাকে আমি নাম দিয়াছি "Give and Take"। মানুষ আজ বিচিত্র রূপে করোনা ভাইরাসকে ও হার মানায় ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে পাল্টিয়ে ... হয়তো আমরা শিখবো একদিন, নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। তথাকথিত চিন্তাধারার বাহিরের জগৎটাকে দেখার চেষ্টা করলে অনেক ভুল সুদূরে নিয়ে নতুন প্রজন্মকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারবো।

--O--

Finding Myself

- Bappi Roy

Eventually, at this stage of life, when we are all struggling to find answers to many of our questions about life and living beings, I realised that first and foremost, I must answer the question: where am I?

Is it me in the body of a 42-year-old me, or I was in the body of a 7-year-old me? I was dreaming as becoming a pilot of an aeroplane should be my aim in life, 35 years ago, as soon as all my limbs and body structures will grow bigger in the future days. However, now I have recently realised that I was lucky enough to not pursue that dream, while I saw in the Corona pandemic that a lot of my crew member friends in airline companies were left with million dollars debt in their lives redundant from their job of the decade. So that I understood my regret of that time not being in the expected profession, which proved me beneficial rather than aimless curse of life.

Nevertheless, that is an indication that not every time my knowledge and learning predict or show

the outcome of planning, is right. My hands and legs changed their size and length in adolescence, and my tummy, shoulders, and hips changed their width and measurements many times. Let me now solve the equation for locating myself to you:

In 1987, Bappi = 3.5 feet tall body, in the year 2000, Bappi = 6 feet tall body and in the year 2022, Bappi = 6 feet tall body plus weighs 108 kilograms.

This equation here shows that, as all these numbers do not resemble the body all the time, they do not also represent the same person all the time. Aside from the name in this equation, other data is constantly changing and is subject to many other variables. So how come I claim that it was the same myself? Mathematically, it is impossible!

On the other hand, at the beginning I have shown that believes and thinking of my mind was proven wrong due to many facts and conditions around the world along the time. Because of that, I can't say that whatever I had spoken or thought earlier was me and you can blame me for that.

The moral of the story is that if I am not the body or the mind, why should I be bothered by something wrong happening to that body, and why should I be disturbed when someone says anything contrary to that belief? Should it be considered as true judgement to others, if I reacted to their response to their behaviour towards me, even though I am not myself? Should someone get the ownership and rewards of doing things or contemplating ideas that were not even theirs to begin with? I leave this verdict to my readers.

Now I want to conclude this observation with one quote from one holy book, which I loved as an inspiration to get along in my life forever.

Colossians: "Work willingly at whatever you do. As though you were working for the lord rather than for people".

Moreover, don't expect any results for your work as you are not really the doer.

--O--





দুর্গম পাহাড়ি এলাকার ক্ষেত থেকে ব্লু-বেরি সংগ্রহ

-ভূতংকর বিশ্বাস

অস্ট্রেলিয়ায় তখন পুরোদস্তুর গ্রীষ্ম। অন্যদিকে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ছিল ক্রিসমাসের লম্বা ছুটি। সব মিলিয়ে সমগ্র অস্ট্রেলিয়া তখন উৎসব মুখর। এসময় আমার স্ত্রী নোভা আসাতে আমার জন্য এই ছুটিটা হয়ে ওঠে আরও বর্ণিল। পিএইচডি শেষ করে ওকাজের ব্যস্ততায় আর ছুটি জনিত জটিলতায় আমার সেলিব্রেশন করা হয়ে ওঠেনি। তাই ব্যস্ততার ফাঁকে উকি দিয়ে অবকাশ যাপনের জন্য একটু করো অখণ্ড অবসর খুঁজছিলাম। অবশেষে নোভাকে নিয়ে ছুটিতে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের মণ্ডু নামক স্থানের গভীর পাহাড়ি জঙ্গলের পাদদেশে ব্লু-বেরি গার্ডেন থেকে ব্লু-বেরি আহরণ।

অস্ট্রেলিয়ায় পাহাড় আর সমুদ্র মিলেমিশে একাকার। সমুদ্র আমাকে খুব একটা কাছে না টানলেও পাহাড়ের প্রতি আমার আকর্ষণ প্রবলতর। এই আকর্ষণের কারণেই আমার বাসা নিউক্যাসল থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের পাদ দেশে বাইট ম্যানসবে নামক ছোট্ট একটা শহরের এক নির্জন এলাকায় একটা ক্যারাভ্যান ভাড়া করেছিলাম ব্লু-বেরি গার্ডেনে যাওয়ার আগে মধ্যবর্তী ক্যাম্প হিসেবে। এই ক্যারাভ্যানে থাকাটাও একটা মজার অভিজ্ঞতা। ক্যারাভ্যান হচ্ছে এক শয়নকক্ষ বিশিষ্ট চাকাওয়ালা বাড়ি। যেটিকে কোনো সুবিধাজনক স্থানে পার্ক করে দিনের পর দিন থাকা যায়।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই রেডি হয়ে আমার টু-হুইল গাড়িতে গিয়ে বসি। মোবাইলে প্রথমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখেতো চক্ষু চড়ক গাছ। বৃষ্টি! বেরি খেত অর্থাৎ বাইট ম্যানসবে এলাকায় ৭০ ভাগ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সেদিন। পরদিন ও বৃষ্টি। অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়ার পূর্বাভাস মোটামুটি নির্ভুল। সুতরাং যাই করি, বৃষ্টির সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে করতে হবে। যেহেতু আগে থেকেই ক্যারাভ্যান ভাড়া করা ছিল আর ২৪ ঘণ্টার নিচে চেক-ইনের সময় হওয়ায় বুকিং বাতিলের সুযোগও নাই। অগত্যা রওনা দিলাম। জিপিএসে বাইট ম্যানসবে যাওয়ার দুটি বিকল্প পথ দেখায়। একটা সমুদ্রের কোল ঘেঁষে প্রিন্সেস হাই ওয়ে দিয়ে। আরেকটি হিউম হাইওয়ে হয়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। উভয় পথেই গন্তব্যে পৌঁছানোর দূরত্ব মোটামুটি কাছাকাছি। যথারীতি পাহাড়ি রাস্তার চ্যালেঞ্জটাকে বেছেনিলাম।

সঙ্গে নোভা থাকায় ভেবেছিলাম যাত্রাপথটা অন্তত আগের মতো বিরজিকর হবে না। কিন্তু সেটা আর হলো কই। গিল্মি মাত্র বাংলাদেশ থেকে আসায় আর বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ার সময় পাঁচঘণ্টা আগে হওয়ায় তাঁর জেটলাগ তখনো কাটেনি। টেনেটুনে আমার সঙ্গে সিডনি পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সঙ্গ দিয়ে ঘুমবাবাজির কাছে শেষ পর্যন্ত হেরেই গেল! ভেবেছিলাম সিডনির ভেতর কোনো এক রেষ্টোরাঁয় আমরা নাশতাটা সেরে নেব। কী আর করা, বেচারীর কাঁচা ঘুমটা নষ্ট না করে ছুটে চললাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

আরও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হিউম হাই ওয়ে দিয়ে ড্রাইভ করার পর আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় উঠতেই ঝাঁকুনিতে নোভার ঘুম ভেঙে গেল। পাহাড়ি রাস্তার শুরুতে কয়েকটি জলপাই বাগান দেখতে পেলাম। জায়গাটি এত সুন্দর ছিল যে, গাড়ি থামিয়ে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। কিন্তু রাস্তাটি এত সরু ছিল যে গাড়ি পার্ক করার কোনো সুযোগও ছিল না। কী আর করা! অগত্যা গাড়ি নিয়ে ছুটে চললাম গহিন পাহাড়ের দিকে। ততক্ষণে আমরা ক্ষুধায়

চৌচির। ভ্রমণ পথে আমার শুকনো খাবার রাখা খুব একটা পছন্দের নয়। কারণ অস্ট্রেলিয়ার সব হাইওয়েতে নিয়মিত দূরত্বে কেএফসি, ম্যাকডোনাল্ডসের মতো চেইন ফাস্ট ফুড শপগুলো জালের মতো বিস্তৃত। কিন্তু আমরা চলেছি পাহাড়ি পথে। সেখানে মানুষ বা গাড়ির আনাগোনা তুলনামূলকভাবে কম। তাই চোখে পড়ার মতো কোনো দোকানও নাই। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর ইয়ারক্সা ভ্যালি নামক স্থানে রাস্তার পাশে একটি ছোট ক্যাফে দেখে সেখানে দাঁড়িলাম। তখনো বুঝতে পারিনি প্রকৃতি আমাদের জন্য কী সাজিয়ে রেখেছে! ক্যাফের এক প্রান্তে প্রসাধন কক্ষে যাওয়ার সময় ছোট্ট একটা তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা ফিজেরয় ওয়াটার ফল-১৫০ মিটার। কৌতূহল মেটাতে সেখানে গিয়ে তো চক্ষু ছানাবড়া! সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০০ মিটার উঁচু থেকে জলপ্রপাত এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতি দুর্গম এলাকায় তার রূপের সমস্ত পসরা বসিয়ে রাখে।

যাহোক, ভ্রমণ পথে বোনাস হিসেবে পাওয়া ফিজেরয় জলপ্রপাত কিছুক্ষণ অবলোকন করে রওনা দিলাম সেদিনের জন্য আমাদের মূল গন্তব্য বাইট ম্যানসবের দিকে। ভয়ংকর সব পাহাড়ি রাস্তার বাঁক (যেখান কার সর্বোচ্চ গতি সীমা ঘণ্টায় মাত্র ১৫ কিলোমিটার) পেরিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে অবশেষে রাত্রি যাপনের জন্য আমাদের ক্যাম্প হিসেবে ভাড়া করা ক্যারাভ্যানে এসে উঠলাম। আগের দিনরাতে নিউক্যাসলে আমাদের বাসায় এসি ছেড়ে ঘুমালে ও সেদিন ক্যারাভ্যানে রুম হিটর চালিয়ে ঘুমতে হলো। এটিই হলো অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে রওনা দিলাম আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের পাদদেশে ক্রেইড নদীর পাশ ঘেঁষে চাষ করা ব্লু-বেরি গার্ডেনের দিকে। যাওয়ার রাস্তাটা এতই অমসৃণ ও পাথরের নুড়িময় ছিল যে, একটু এদিক-সেদিক হলে প্রায় এক কিলোমিটার নিচে সোজা পাহাড়ি খাদে! কিছু কিছু জায়গায় অবস্থাটা এমন ছিল যে, আমার স্ত্রী রীতিমতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছিল। যাহোক, এভাবে ছোট ছোট আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বেরি গার্ডেনের সাইন অনুসরণ করে এক সময় পৌঁছালাম আমাদের কাজিক্ষত ক্রেইড রিভার বেরিফার্মে।

ব্লু-বেরি একটি মৌসুমি ফল। যেটি অস্ট্রেলিয়াতে সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পাওয়া যায়। যদিও সুপার মার্কেট গুলিতে প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায়, তবে তা গ্রিন হাউসে উৎপাদিত। যাহোক, বেরি গার্ডেনে ঢোকার সময় কর্তৃপক্ষ আমাদের দুজনের কাছে দুটি প্লাস্টিকের বালতি ধরিয়ে দিয়ে বেরি খেতের নিয়মাবলি বলে দিল। নিয়ম হচ্ছে আমরা যতটুকু ব্লু-বেরি তুলব তা পরে ওজন করে দাম মেটাতে হবে (অবশ্য দাম প্রায় খুচরা বাজারের এক-তৃতীয়াংশ)। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ছিল- ব্লু-বেরি তোলা যাবে বটে, কিন্তু তোলার সময় একটিও খাওয়া যাবে না। যতক্ষণ না ওজন করে কড়ায়-গন্ডায় দাম মেটানো হয়। নিয়মটা আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। কারণ জীবদ্দশায় আমি এত বড় সংযম কোনো দিনই করিনি। আমার শৈশবই কেটেছে অন্যের গাছের নারকেল, আম ইত্যাদি চুরি করে! বলতে দ্বিধা নেই-ব্লু-বেরি তোলার সময়ও সে সংযম দেখাতে পারিনি!

--O--





স্বপ্নপুরীতে দুঃস্বপ্ন - সংগীতা সাহা

শ্রেষ্ঠাপট: স্বর্গরাজ্য (সব চরিত্র কাল্পনিক)

স্ক্রিনে নাম উঠবার সময় পর পর, স্ক্রিনে দেখানো হবে..

খবর পাঠিকা : গত এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর দুটি বহুতল প্রাসাদ ধ্বস ও অগ্নিকাণ্ডে দেড়শত নিহত ও দুশতাধিক আহত হবার ঘটনায় স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নপুরবাসী এখন দুঃস্বপ্নের রাত্রিযাপন করছে, এখনো নিখোঁজ অর্ধশতাধিক। উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে, স্বজনদের আর্ত চিৎকারে ভারী হয়ে উঠছে উজান দীঘি ও অচিনপুর এলাকা। ঘটনাস্থল ঘুরে রিপোর্ট করছেন সাংবাদিক অনুপম।

(হট্টগোলের আওয়াজ)

সংবাদ পাঠিকা: হ্যালো! অনুপম শুনতে পাচ্ছেন! হ্যালো! হ্যালো অনুপম! (ভয়েজ ওভার)

দৃশ্য-১

সাংবাদিক: হ্যাঁ ঐন্দ্রীলা শুনতে পাচ্ছি (এক কানের এয়ার ফোন ঠিক করতে করতে) ধন্যবাদ। আপনি যথার্থই বলেছেন ঐন্দ্রীলা, দুঃস্বপ্নের মতই প্রিয়জন হারানোর ব্যথা বয়ে চলেছে স্বর্গরাজ্য বাসী। তবে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম নয় আগেও ঘটেছে বহুবার কিন্তু বিচারহীনতার অভাবে এবং অজানা আসুরিক ক্ষমতা বলে অপরাধীরা অবাধে বিচরণ করছে।

ভয়েজ ওভার-মহামন্ত্রীর মহোদয়ের আগমন-শুভেচ্ছা স্বাগতম, নগর পালের আগমন-শুভেচ্ছা স্বাগতম। মহামন্ত্রী ও নগরপাল মঞ্চে একটু ঢুকে মহামন্ত্রী তার গলার মালা গুলো ঠিক করে হাত নাড়তে নাড়তে এগোবে এবং সাংবাদিকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াতে থাকবে

সাংবাদিক: কিছুক্ষণ আগে স্বর্গরাজ্যের মহামন্ত্রী ও স্বপ্নপুরীর নগর পাল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসেছেন; আমি এখন কথা বলল মহামন্ত্রী ও নগর পালের সঙ্গে। মাননীয় মহামন্ত্রী প্রাসাদ নির্মাণের পরিকাঠামো আর অনুমোদন প্রদানে নানারকম অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসছে আপনাদের দুজনের বিরুদ্ধে, আপনাদের কি বক্তব্য?

মহামন্ত্রী: দেখুন উজান দীঘির এই ভবন ধ্বসের আগে আমাদের কয়েকজন খবর দিয়েছিল যে, কিছু বিরোধী দলের দুষ্কৃতিকারী হাতুড়ি- কুড়াল দিয়ে ভবনে আঘাত করছে, তখন আপনাদের মিডিয়া কোথায় ছিল? আর এখন ভবনটা ধ্বসে যাবার পর দায় আমাদের দিচ্ছেন!

সাংবাদিক: এমন ঘটনা ঘটেছে কই আমরা তো জানতে পারলাম না! আচ্ছা, এটা তারা দিনে করেছে না রাতে করেছে?

মহামন্ত্রী: রাতে!

নগরপাল: দিনে !

(দুজন দুজনার দিকে ইঙ্গিত করে একবার দেখে, সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে বলবে)

মহামন্ত্রী: দিনে!

নগরপাল: (একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) রাতে!

সাংবাদিক : তারমানে আপনারা বলতে চাইছেন কিছু দুষ্কৃতিকারীরা দিনরাত হাতুড়ি- কুড়াল দিয়ে একটা দশতলা ভবন ভেঙ্গে ফেলেছে!

নগর পাল: হ্যাঁ তাইতো বলছি।

সাংবাদিক: তাহলে কি অচিনপুর বাজারে তারাই আগুন লাগিয়েছে ?

মহামন্ত্রী: একদম ঠিক ধরেছেন। সামনে ইলেকশান,মতাই আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার নীলনকঁশা ঐক্কেছে তারা। একেবারে জলের মত পরিস্কার - ষড়যন্ত্র, গভীর ষড়যন্ত্র।

নগরপাল: আমাদের এখন অচিনপুরের অগ্নিদগ্ধ এলাকা পরিদর্শনে যেতে হবে, চলুন মহামন্ত্রী। (কাঁধের কাছাকাছি মুখ নিয়ে কিছু বলবে এবং ডান হাত দিয়ে পথ দেখিয়ে বের হয়ে যাবে)।

সাংবাদিক: মহামন্ত্রী ও নগরপালকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্বর্গবাসী, এইমাত্র একটি চানচল্যকর তথ্য বেরিয়ে এলো মহামন্ত্রী ও নগরপালের সাথে আলাপচারীতায়; তাদের দাবি, কিছু বিরোধী দলীয় দুষ্কৃতিকারী হাতুড়ি-কুড়াল দিয়ে আঘাত করে উজান দীঘির একটি সুবিশাল ১০ তলা ভবন ভূপাতিত করেছে, অপরদিকে অচিনপুর এলাকার বাজারে ও নাকি তারাই ভরদুপুরে আগুন লাগিয়েছে। ঐন্দ্রীলা।

(লাইট অফ স্ক্রিনে দেখানো হবে)

সংবাদ পাঠিকা: ধন্যবাদ সাংবাদিক অনুপম। দর্শক, মহামন্ত্রী ও নগর পালের দেয়া বক্তব্য সমস্ত স্বর্গরাজ্যে ব্যাপক ভাবে আলোচনার ঝড় তুলেছে। কেউ কেউ এটাকে মিথ্যা, বানোয়াট এবং হাস্যকর বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন এবং স্বর্গবাসীকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দলনের আহ্বান জানিয়েছেন.....

দৃশ্য-২

(নীল ডিমলাইট জ্বলা শয়ন কক্ষ, একটা বিছানা আর দুপাশে টেবিলের ওপর ল্যাম্প। ক্যার ক্যার ক্যার দরজা খোলার শব্দ)

নগরপাল: (ফিসফিসিয়ে) মহামন্ত্রী, মহামন্ত্রী, (জোড়ে) মহামন্ত্রী..

মহামন্ত্রী: এ্যা এ্যা এ্যা কে ? কে ডাকে এ্যা! এই রাত বিরাতে এ্যা কে ডাকে?

(বলতে বলতে উঠে ল্যাম্প অন করে দুপা হেঁটে নগর পালের একটু সামনে দাঁড়িয়ে ফিতায় বাঁধা চশমা পরবে)

নগর পাল তুমি এত রাতে, এখানে আমার শয়ন কক্ষে কি করছো?

নগরপাল: মহামন্ত্রী ওরা আসছে, ও-ও-রা আসছে মহামন্ত্রী...

(ভয়ে ভয়ে বাম পাশে দেখিয়ে)

আমাদের কাউকে ছাড়বে না, মহামন্ত্রী কাউকে ছাড়বে না, পালান তাড়াতাড়ি প্রাসাদ থেকে পালান।

(বলতে বলতে মহামন্ত্রীর পেছন দিক দিয়ে ডানে বের হবে ভয়ে পালিয়ে যাবার মত করে) সাদা থান পরা আত্মারা। (কম পক্ষে চারজন) ঢুকে নগর পালের জায়গায় আত্মা-১ দাঁড়াবে, আত্মা-২ মন্ত্রীর পেছনে ডানে, আত্মা-৩ ও আত্মা-৪, আত্মা-১ ও আত্মা-২ এর পেছনে V করে মন্ত্রীকে মাঝে রেখে দাঁড়াবে)

মহামন্ত্রী: কি সব বলছো তুমি (হেসে হেসে), প্রাসাদ থেকে পালাবো কেনো, কে কি ছাড়বেনা; কারা আসছে (বলে আত্মা একের দিকে তাকাবে, চমকে গিয়ে বলবে)

তুমি কে? এখানে কিভাবে এলে, প্রহরী, প্রহরী (কোনো সারা না পেয়ে) কি চাও আমার কাছে

আত্মা-১: আমাদের দেবার মত কিছুই নেই তোমার।

মহামন্ত্রী: কে তুমি ?

আত্মা-১: আমাদের চিনলে না! অচিনপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে স্বর্গবার্তা পত্রিকার প্রথম পাতায় পুড়ে কয়লা হওয়া যে মৃতদেহের ছবি ছাপা হয়েছিল, আমিই সেই মৃতদেহ, বেঁচে থাকতে নাম ছিল উর্মিলা। অসুস্থ পাঁচ বছরের মেয়েটা আমার আবদার করেছিল তাকে একটা কথা বলা খেলনা পুতুল কিনে দিতে হবে; মেয়ের আবদার পূরণ





করতে পারলাম না, পুতুল কিনতে গিয়ে কয়লা হয়ে গেলাম।
(কাঁদতে কাঁদতে বলবে)

মন্ত্রী: কি সব উল্টোপাল্টা বলছো, প্রহ..

(ডানে মোড় ঘুরে পা বাড়াতে আত্মা-২ কে দেখে বলবে) রী 'ই'হি
(টোক দিলে একটু ভয় পেয়ে)

তুমি আবার কে?

আত্মা-২ : আমাকে চিনলেন না? উজান দীঘির ভবন ধ্বংসের দুই দিন
পর উদ্ধার পাওয়া লাশ আমি, (কটাক্ষের স্বরে) এত তাড়াতাড়ি ভুলে
গেলেন লোকে আমাকে মধু পালোয়ান বলে ডাকতো, পরিবারে
একমাত্র উপার্জন করতাম আমি। আপানারাতো বজ্রতা দিয়েই
খালাস, কে জানে আমার অসুস্থ মা আর পোয়াতি বউটা দুবেলা
খাইতে পাইতেছে কিনা! (কষ্ট কম্পিত স্বরে)

সব আত্মা: আপনি ও আপনার মত ঘুষখোর, ভন্ডরা স্বর্গরাজ্যে
থাকলে আমাদের মত লাশে পরিনত হবে গোটা স্বর্গপুরী; তাই
আমরা আপনাকেসহ বাকিদের স্বর্গরাজ্য থেকে যমালয়ে নিয়ে যেতে
এসেছি।

মন্ত্রী: আ আ কি সব হাবিজাবী বলছো এ্যা ! আ আ আ...

(হাঁপাতে হাঁপাতে বামে ঘুরে বাম দিয়ে সামনে দৌড়ের মত করে
এগিয়ে প্রথমে চমকে পরে ভাল করে যমদূতকে দেখে বলবে) দেবী
কিরণ মালা তুমি, দেখোনা দেবী কিরণমালা ওরা কি সব বলছে।

যমদূত: আমি যমদূত

মহামন্ত্রী: যমদূত হা হা হা (হেসে)

যমদূত: সকলে আমার নাম শুনে ভয় পায় আর তুমি হাসছো!

মহামন্ত্রী: ভালই বলেছো য-ম-দূ-ত। ভয়! সে তো প্রতিদিনই
পাই। সব সময়ই তো পাই (ব্যঙ্গ করে)

(দর্শকদের দিকে তাকিয়ে তর্জনী নির্দেশ করে রসিকতার ছলে বলবে) কি ঠিক
বলেছিলা বলুন?

যমদূত: আহ, রসিকতা ছাড়ুন, আমি আপনার ঘরের বউ নই যে,
সবসময় আপনার কথার জালে ফাঁসাবেন? আমি যমরাজের দূত।
এবার বলুন কোন উপায়ে নিজের মৃত্যু হয়েছে জানাতে চান স্বপ্নপুর
বাসীকে কে?

(মঞ্চে সর্বদানে স্পটলাইটে মাইক্রোফোন হাতেসাংবাদিক)

সাংবাদিক : এইমাত্র পাওয়া খবরে জানা গেছে গত কাল গভীর রাতে
মহামন্ত্রীর প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং উদ্ধারকর্মীরা
তাদের কাউকেই জীবিত উদ্ধার করতে পারেননি।

মহামন্ত্রী: (হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাবড়ানোর স্বরে) এ-এই যে যমদূত শুনুন;
এখনো আমার কন্যাকে বিবাহ দেইনি আর পুত্রের ঘরে অল্পকদিন
হল সন্তান হয়েছে। তার উপর আমার স্ত্রী সেই কবে থেকে বায়না
করে রেখেছে মহাবিশ্ব ভ্রমণে যাবে, এখন আমি মারা গেলে এসব
কিভাবে হবে?

যমদূত: পরবর্তী উপায় (কিছুটা উচ্চস্বরে)

সাংবাদিক: এইমাত্র পাওয়া খবরে জানা গেছে গতকাল গভীর
রাতে মহামন্ত্রীর প্রাসাদে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সমস্ত প্রাসাদ পুড়ে
কয়লা হয়ে গেছে, উদ্ধার কর্মীরা তাদের কাউকেই

মহামন্ত্রী: (হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাবড়ানোর স্বরে) এই যে সাংবাদিক থামো
থামো। (সাংবাদিককে থামিয়ে দিয়ে) বলছিলাম কি যমদূত আমার
শয়ন কক্ষের এই পালঙ্কটা স্বর্ণের তৈরি আর এর নিচে একটি গুপ্ত
সিন্ধুকে মূল্যবান ধনরত্ন, হীরা জহরত লুকানো আছে; এই সবকিছু

নিয়ে যান আপনারা, শুধু আমাকে ছেড়ে দিন। (প্রলোভন দেখানোর
স্বরে)

যমদূত: বাহ! তুমি যমদূতকে ঘুষ দিতে চাইছো? যমরাজ সঠিক
সিদ্ধান্তই নিয়েছেন দেখছি, তোমাদের মত নিজের আখের গোছানো
দুর্নীতিগ্রস্তরা শুধু স্বর্গরাজ্যের জন্যই ক্ষতিকর নয় যমালয়ের সকল
স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেও ভীষণ গভগোল পাকিয়ে ফেলছে। যমরাজ
আর সকল যমদূত রাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন তোমাদের
কারণে; না তোমাকে আর কোনো সুযোগ দেওয়া যাবেনা, আমাকে
আবার আরেক মন্ত্রীর প্রাসাদে যেতে হবে। এই যে তোমরা সবাই
ওকে শক্ত করে ধরো, আমি ওর প্রাণ হরণ করবো।

(আত্মা মহামন্ত্রীকে ঘিরে ঘিরে ধরবে মহামন্ত্রী চিৎকার করে বলবে- লাইট অফ
হবে)

মহামন্ত্রী: আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরোনা, আমি আর ঘুষ
নেবোনা, দুর্নীতি করবো না সত্যি বলছি আমি ভাল হয়ে যাবো, সৎ
পথে চলবো , আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়েদাও...(গোঙাতে থাকবে)

দেবী কিরণমালা: উমা কি হল (হাই তুলতে তুলতে বিছানা থেকে
উঠে সামনে আসতে আসতে) ! মরণ দশা আমার, একদিনও রাতে
যদি ঠিকমত ঘুমাতে পারি; এই যবে থেকে সোনার পালঙ্ক আর
ধনরত্ন ভরা সিন্ধুক শয়ন কক্ষে ঢুকেছে তবে থেকে এই একই
দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার চৈতামেচি মাঝ রাতে, উফ আর পারিনা (
বিছানায় বসে মহামন্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে) এই যে গুঠুন, চিৎকার বন্ধ
করে চোখে মুখে জল দিয়ে আমাকে উদ্ধার করুন। আমার হয়েছে
যত জ্বালা।

মহামন্ত্রী: আর একটু হলেই প্রাণটা গিয়েছিল! তুমি কি বুঝবে? যাকে
একবার সাপ দংশন করেছে সেই কেবল বোঝে বিষের কি জ্বালা।
(বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলবে)

দেবী কিরণমালা: তাবে বুঝলে এতদিনে?! তা এমন কাজ করো কেন
যে রাতে শান্তি মত ঘুমোতে পারোনা?

মহামন্ত্রী : তাহলে তোমার হীরের হার, মণিমুক্তা খচিত পোশাক আর
মহাবিশ্ব ভ্রমণের ব্যবস্থা হবে কি করে শুন?

দেবী কিরণ মালা: এই যে মহামন্ত্রী মহোদয়, একটা কথা আজ কান
খুলে শুনে রাখো, আমি বা তোমার সন্তানেরা কত কিছুই না আবদার
করি অহরহ, কিন্তু তুমি তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী কত টুকু পূরণ
করবে, সে সিদ্ধান্তের দায় কখনই তুমি আমাদের দিতে পারোনা!
তোমার সৎ পথের উপার্জনেই আমরা সন্তুষ্ট থাকবো। আর যদি
বলো তুমি আমাদের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করে আয় করেছো?
সেটা আমরা কখনই চাইব না, খামোখা নিজের ক্ষমতা আর
প্রতিপত্তির লালসার দায় অন্তত আমাকে দিওনা (ব্যঙ্গাত্মক স্বরে)
আর মনে রেখো তোমার সৎ পথের আয়ে যদি মোটা ভাত আর
মোটা কাপড় জোটে আমি আর তোমার সন্তানেরা তাতেই সন্তুষ্ট
থাকবো তবু অসৎ পথকে সমর্থন করবো না (বলে বিছানায় শুতে যাবে)

মহামন্ত্রী: এই কথাগুলো কেন আগে ভাবিনি! হায়!! (বলে মাথায় হাত
দিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পরবে) ভুল সবই ভুল ... জীবনের পাতায় পাতায়
যা লেখা সবই ভুল, সবই যেন দুঃস্বপ্ন। (বসা থেকে উঠতে উঠতে
বেসুরে গাইবে দুবার গাইবার পর স্থির হয়ে দাঁড়াবে লাইট নিভে
যাবে।

বি. দ্র.নটকটি ২০১৯ সালে বি এস পি সির গ্রান্ড কালচারাল নাইটে পরিবেশিত হয়।
নির্দেশনা দেন শর্মিষ্ঠা সাহা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন - পলাশ বড়ুয়া, বাপী রায়, পান্না
বড়ুয়া লিজা, 'অর্ক ভট্টাচার্য, বিস্ময়, শান্তি ও শর্মিষ্ঠা সাহা।

--O--





B
S
P
C
I

A
L
B
U
M





B
S
P
C
I

A
L
B
U
M





B
S
P
C
I

A
L
B
U
M





PERTH AUTOMOTIVE SOLUTIONS

AUTOMOTIVE MOBILE MECHANIC SERVICES: WE COME TO YOU

South of the river location (Thornlie). Booking essential.

Please call NAZRUL on **0466044766** or email to: service@pasolutions.com.au

We provide Mobile Automotive Mechanic service at your door step for your all Servicing and maintenance need for your vehicles. Perth Automotive Solutions is WA's Licensed Repairer run by qualified and industry experienced Engineers and technicians.

Our services:

- ❖ General service
- ❖ Logbook service
- ❖ Mechanical repair
- ❖ Brakes repair
- ❖ Electrical and electronics repair
- ❖ Diagnostic checks and repair
- ❖ Pre-purchase inspection
- ❖ Head Lights Restoration

